চতুর্থ অধ্যায়

আখলাক

আমরা তো আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নানারকম কাজ করে থাকি। একটু চিন্তা করে দেখো তো এ বছর এখন পর্যন্ত তুমি যে সকল কাজ করেছ, সেগুলোর মাঝে এমন কোনো কাজ রয়েছে কিনা যেগুলোর মাধ্যমে নৈতিক বা মানবিক গুণাবলি প্রকাশ পায়? নৈতিক বা মানবিক গুণাবলি সম্পর্কে যদি তোমার কোনো ধারণা না থাকে তাহলেও কোনো সমস্যা নেই। চিন্তা করে দেখো, এ বছর তুমি কি কি এমন কাজ করেছ যেগুলো তোমার কাছে মনে হয়েছে অনেক ভালো কাজ। সেগুলোই চিন্তা করে বের করে সহপাঠী বন্ধুদের সাথে আলোচনা করো। শিক্ষক তোমাদের এই বিষয়ে আরও সহায়তা করবেন। আর এই অধ্যায়ের পাঠ থেকে তুমি এই বিষয়টি সম্পর্কে আরও গভীরভাবে জানতে পারবে। তাই পাঠে প্রবেশের পূর্বে শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসারে কিছু কাজ সম্পন্ন করে ফেলো।

উত্তম চরিত্র (اَلْاَخْلَاقُ الْحَمِيْدَةُ)

চরিত্র মানব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। একজন শিশুকে আদর্শ মানুষরূপে গড়ে তুলতে হলে তার মধ্যে উত্তম চারিত্রিক গুণাবলির বিকাশ ঘটাতে হবে। সাধারণত বিনয়, নম্রতা, সততা, ধৈর্য, ক্ষমা, তাকওয়া, ওয়াদা পালন করা, আমানত রক্ষা করা, সৃষ্টির সেবা করা এগুলো মানুষের চরিত্রের উত্তম দিক। অপরদিকে হিংসা, বিদ্বেষ, সুদ, ঘুষ, ক্রোধ, লোভ-লালসা, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, মাতাপিতার অবাধ্য হওয়া ও অসদাচরণ করা মানুষের চরিত্রের মন্দ দিক। কুরআন মাজিদ ও রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাদিসে চরিত্র গঠনের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন,

مَنْ وُلِدَ لَهٗ وَلَدٌ افَلْيُحْسِنْ اِسْمَهٗ وَاَدَبَهٗ

অর্থ: ‘কারও সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সে যেন তার একটি সুন্দর নাম রাখে এবং উত্তমরূপে তাকে আদব-কায়দা, শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়।’ (বায়হাকী)

আখলাক (اَلْاَخْلَاقُ) একটি আরবি পরিভাষা। এটি ‘খুলুকুন’ (خُلُقٌ) শব্দের বহুবচন। এর অর্থ হলো— চরিত্র, স্বভাব, আচার-আচরণ, ব্যবহার, সদাচার, সৌজন্যমূলক আচরণ ইত্যাদি। আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে প্রাত্যহিক কাজ-কর্মের মধ্য দিয়ে যেসব আচার-ব্যবহার, চাল-চলন এবং স্বভাবের প্রকাশ পায় সেসবের সমষ্টিই হলো আখলাক। এককথায়, মানুষের আচার-আচরণ, চিন্তা-চেতনা ও দৈনন্দিন কাজকর্মের মধ্য দিয়ে যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয় তা-ই আখলাক বা চরিত্র।

শব্দগত দিক বিবেচনায় মানুষের ভালো ও মন্দ উভয় দিক মিলেই চরিত্র। কিন্তু প্রচলিত অর্থে আখলাক শব্দটি খারাপ চরিত্র বুঝায় না; মানুষের মার্জিত, সুন্দর, নির্মল ও উত্তম আচরণকেই বুঝায়। যেমন আমরা মন্দ চরিত্রের লোককে চরিত্রহীন বলে থাকি। এর অর্থ এই নয় যে, তার কোনো চরিত্র নেই। কেননা, ভালো হোক, মন্দ হোক তার এক ধরনের চরিত্র রয়েছে। তাই এখানে চরিত্রহীনতার অর্থ হলো ভালো চরিত্র না থাকা। অতএব মানুষের ভালো ও মন্দ দিক বিবেচনায় আখলাক বা চরিত্র দুই প্রকার। যথা–

১. আখলাকে হামিদাহ (اَلْأَخْلَاقُ الْحَمِيْدَةُ) তথা প্রশংসনীয় চরিত্র বা উত্তম চরিত্র;

২. আখলাকে যামিমাহ (اَلْأَخْلَاقُ الذَّمِيْمَةُ) তথা নিন্দনীয় চরিত্র বা মন্দ চরিত্র।

আখলাকে হামিদাহ (প্রশংসনীয় চরিত্র)

আমরা জেনেছি যে, আখলাক (اَلْأَخْلَاقُ) অর্থ হলো– চরিত্র বা স্বভাব। আর হামিদাহ (الحَمِيْدَةُ) শব্দের অর্থ প্রশংসনীয়। অতএব আখলাকে হামিদাহ (اَلْأَخْلَاقُ الْحَمِيْدَةُ) অর্থ প্রশংসনীয় চরিত্র । আখলাকে হামিদাহ তথা প্রশংসনীয় চরিত্রের অপর নাম হলো আখলাকে হাসানাহ বা উত্তম চরিত্র। মানুষের সামগ্রিক আচার-আচরণ, চিন্তা-চেতনা ও দৈনন্দিন কাজকর্মের মধ্য দিয়ে যে উত্তম স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয় তা-ই আখলাকে হামিদাহ (اَلْأَخْلَاقُ الْحَمِيْدَةُ) বা উত্তম চরিত্র।

ইসলামে মানব চরিত্রের যে সব মহৎ গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোই হলো আখলাকে হামিদাহ বা উত্তম চরিত্র। সাধারণত বিনয়, নম্রতা, ধৈর্য, ক্ষমা, তাকওয়া, ওয়াদা পালন করা, সততা-সত্যবাদিতা, আমানত রক্ষা করা, পরোপকার, পরমতসহিষ্ণুতা, শিষ্টাচার, শালীনতাবোধ, নিজের কাজ নিজে করা, পরিচ্ছন্ন থাকা, সৃষ্টির সেবা করা, বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান করা, দেশপ্রেম ও সমাজ সেবা প্রভৃতি গুণাবলিই আখলাকে হামিদাহ বা উত্তম চরিত্র।

পৃথিবীর সকল নবি-রাসুল ও মহাপুরুষগণ মানবজাতিকে উত্তম চরিত্র শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের মহানবি (সা.) কে মহান চরিত্রের অধিকারী করে সৃষ্টি করেছেন। তাই রাসুলুল্লাহ (সা)-এর জীবনাদর্শই হলো প্রশংসনীয় চরিত্র বা উত্তম চরিত্রের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজিদে এ কথা ঘোষণা করে বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

অর্থ: 'তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসুলের মাঝে রয়েছে উত্তম আদর্শ।' (সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ২১)

একারণেই মানুষকে উত্তম চরিত্র শিক্ষা দেওয়ার জন্য মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসুলকে পাঠিয়েছেন। মহানবি (সা.) তাঁর প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন,

اِنَّمَا بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ

অর্থ: 'আমি উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা সাধনের জন্যই প্রেরিত হয়েছি।' (মুসনাদে আহমদ)

আখলাকে হামিদাহ-এর গুরুত্ব

উত্তম চরিত্র মানবজীবনের সবচাইতে মূল্যবান সম্পদ। আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সমাজিক জীবনে আখলাকে হামিদাহ-এর গুরুত্ব অনেক। মূলত আখলাকে হামিদাহ বা প্রশংসনীয় চরিত্রের উপরই সমাজের শান্তি, শৃঙ্খলা ও সফলতা নির্ভর করে। একজন উত্তম স্বভাবের অধিকারী ব্যক্তি যেমন সমাজে শ্রদ্ধাভাজন ও ভালোবাসার পাত্র হয়ে থাকেন, তেমনি মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের কাছেও তিনি প্রিয় হয়ে থাকেন। বিপরীত দিকে একজন অসৎ ও মন্দ চরিত্রের লোক সমাজে ঘৃণার পাত্র এবং আল্লাহর নিকট অপ্রিয় হয়ে থাকে।

আখলাকে হামিদাহ হলো মৌলিক মানবীয় গুণাবলির সমষ্টি। এটি মানবজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। এটি নষ্ট হয়ে গেলে ব্যক্তির আত্মমর্যাদা ও সম্মান কিছুই থাকে না। চরিত্রের চেয়ে মূল্যবান আর কিছুই নেই। টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত কিংবা স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে গেলে তা আবার ফিরে পাওয়া যায়; কিন্তু চরিত্রে একবার কলঙ্ক লাগলে তা আর দূর করা যায় না। এ জন্য রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا

অর্থ: 'তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই উত্তম যার চরিত্র বা আখলাক সর্বোৎকৃষ্ট।' (বুখারি ও মুসলিম)

উত্তম চরিত্র ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তার উৎস। আখিরাতে কল্যাণ লাভও আখলাকে হামিদাহ-এর উপর নির্ভর করে। এর মাধ্যমে পরম পুণ্য অর্জন করা যায়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ

অর্থ: 'কিয়ামতের দিন যে জিনিসটি মুমিনের পাল্লায় সবচেয়ে ভারী হবে সেটি হলো উত্তম চরিত্র।' (আবু দাউদ)

উত্তম চরিত্র একজন পরিপূর্ণ মুমিনের অনন্য বৈশিষ্ট্য। মুমিনদের মাঝে পূর্ণাঙ্গ ইমানের অধিকারী তারাই, যারা সুন্দর ও প্রশংসনীয় চরিত্রের অধিকারী। তাই এটি ইমানের পূর্ণতা দেয়। এ ছাড়া উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি মহান আল্লাহর ভালোবাসা লাভে ধন্য হয়। ফলে তার ইহকালীন ও পরকালীন অফুরন্ত কল্যাণ সাধন হয়। সর্বোপরি উত্তম চরিত্র জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাত লাভের অন্যতম উপায়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা যার গঠন ও স্বভাব সুন্দর করেছেন, দোযখের অগ্নি তাকে ভক্ষণ করবে না।' (তাবারানি ও বায়হাকি)

আখলাকে হামিদাহ অর্জনের উপায়

মহান আল্লাহর হুকুম পালনের মাধ্যমে আখলাকে হামিদাহ অর্জন করা যায়। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে যে সকল কাজ করতে বলেছেন, সে সকল কাজ করা এবং যে সকল কাজ করতে নিষেধ করেছেন, সে সকল কাজ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমেই উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া সম্ভব। এককথায় মানবীয় মহৎ গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমেই আখলাকে হামিদাহ অর্জিত হয়। যেমন– মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ইমান আনা, তাঁদের আদেশ-নিষেধ মেনে চলা, পিতা-মাতা ও বয়োজ্যেষ্ঠদের কথা মান্য করা, সত্য বলা, ধৈর্য ধারণ করা, কর্তব্যপরায়ণ হওয়া, ওয়াদা পালন করা, আমানত রক্ষা, কথা-বার্তায় শালীনতা বজায় রাখা, সৃষ্টিজীবের সেবা করা, সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, অসহায়দের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া, মিথ্যা না বলা, প্রতারণা না করা,

হিংসা-দ্বেষ থেকে বেঁচে থাকা, ধূমপান পরিহার করা, অসৎসঙ্গ ত্যাগ করা, দয়া ও ক্ষমা করা, বন্ধু-বান্ধবের সাথে আন্তরিক হওয়া, প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করা, রোগীর সেবা করা, বেশি বেশি কুরআন ও হাদিস অধ্যয়ন করা প্রভৃতি গুণ অর্জনের মাধ্যম আখলাকে হামিদাহ অর্জন করা যায়।

বস্তুত দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ লাভের জন্য প্রত্যেক মানুষের উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া একান্ত কর্তব্য। অন্যথায় মানবজীবন ব্যর্থতা ও গ্লানিতে পরিপূর্ণ হবে।

বিনয় ও নম্রতা

বিনয় ও নম্রতা মানুষের অন্যতম মহৎ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। বিনয়ী ব্যক্তিকে মানুষ যেমন ভালোবাসেন, তেমনি আল্লাহও তাকে অনেক ভালোবাসেন। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নবি ও রাসুল মুহাম্মাদ (সা.) ছিলেন বিনয় ও নম্রতার মূর্তপ্রতীক। তিনি সুমহান চরিত্রের অধিকারী ছিলেন।

বিনয় ও নম্রতার পরিচয়

বিনয় ও নম্রতা দুটি সমার্থক শব্দ। বিনয় শব্দের অর্থ হলো, নম্রভাব, নম্রতা, কোমলতা, মিনতি ইত্যাদি। আর নম্রতা শব্দের অর্থ হলো বিনীত, ঔদ্ধত্যহীন, নিরহংকার, অবনত, নরম, কোমল, শান্ত-শিষ্ট ইত্যাদি। এ দুটি শব্দের বিপরীত শব্দ হলো- ঔদ্ধত্য, কঠোরতা, অহংকার, হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি। কথাবার্তা, কাজ-কর্ম, চাল-চলন ও আচার-আচরণে অন্যের তুলনায় নিজেকে ছোট ও ক্ষুদ্র মনে করা এবং অন্যদেরকে বড় ও সম্মানিত মনে করাই বিনয়।

পারিভাষায় বিনয় হলো, নিজেকে সৃষ্টি জগতের মধ্যে উঁচু মর্যাদার অধিকারী মনে না করা এবং নিজের চেয়ে অন্যকে কোনো অবস্থায় নিকৃষ্ট মনে না করা। সর্বোপরি মানুষ ও মহান আল্লাহর প্রত্যেক সৃষ্টি জীবকে স্ব-স্ব সম্মান প্রদান করার নামই বিনয় ও নম্রতা।

বিনয় ও নম্রতার গুরুত্ব

বিনয় মানবজীবনের একটি অত্যন্ত মহৎ গুণ এবং চারিত্রিক ভূষণ। যার বিনয় ও নম্রতা রয়েছে সে দুনিয়া ও আখেরাতের অফুরন্ত কল্যাণ লাভে ধন্য হবে।

বিনয় আল্লাহর পছন্দনীয় একটি গুণ

বিনয় আল্লাহর নিকট খুবই পছন্দনীয় একটি গুণ। ব্যক্তির কথাবার্তা, আচার-আচরণ, লেন-দেন, ওঠা-বসায় এমনকি হাঁটা-চলায় বিনয় প্রকাশ পায়। কুরআন মাজিদে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'পরম করুণাময়ের (আল্লাহর) বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে বিনয়ের সাথে চলাফেরা করে।'(সূরা ফুরকান, আয়াত: ৬৩)

কোমলতা ও নম্রতা আল্লাহর বিশেষ গুণ

বিনয় ও নম্রতা আল্লাহর একটি বিশেষ গুণ। তিনি যেমন নম্রতা ও বিনয় অবলম্বনকারী তেমনি কোমলতা ও বিনয়ী ব্যক্তিকে তিনি ভালোবাসেন এবং তাকে অফুরন্ত কল্যাণ দান করেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) এ প্রসঙ্গে বলেন,

إِنَّ اللّٰهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ

অর্থ: ‘আল্লাহ তা‘আলা বিনম্র, তিনি নম্রতা পছন্দ করেন। (মুসলিম)

মর্যাদা লাভের একটি বিশেষ সোপান

বিনয় ও নম্রতা মর্যাদা লাভের একটি বিশেষ সোপান। সমাজে বিনয়ী ব্যক্তিকে সবাই পছন্দ করে ও সম্মান দেখায়। কেউ যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বিনয়ী হয়, তবে আল্লাহ তা‘আলা তার মর্যাদাকে বাড়িয়ে দেন। তাই লেনদেনসহ সর্বপ্রকার আচার-আচরণে বিনয় ও নম্রতা প্রদর্শন করা ইসলামের অন্যতম শিক্ষা। এ প্রসঙ্গে রাসুল (সা.) বলেন, ‘আর কেউ আল্লাহর জন্য বিনয়ী হলে, আল্লাহ তার সম্মান বাড়িয়ে দেন।’ (মুসলিম)

এটি মহান আল্লাহর নির্দেশ

আল্লাহ তা‘আলা কথাবার্তা, কাজ-কর্ম, চাল-চলন ও আচার-আচরণে ঔদ্ধত্য ও অহংকার ত্যাগ করে বিনয়ী হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। ধীর-স্থির ও নম্রতা অবলম্বনপূর্বক সংযত হয়ে চলাফেরা করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন,

وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ

অর্থ: ‘সংযত হয়ে চলাফেরা করো এবং তোমার কণ্ঠস্বরকে সংযত রাখো। নিঃসন্দেহে গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর।’ (সূরা লোকমান, আয়াত: ১৯)।

মুমিনের বৈশিষ্ট্য

বিনয় ও নম্রতা একজন মুমিনের অনন্য বৈশিষ্ট্য। রাসুলুল্লাহ (সা.) মুমিনের প্রশংসা করে বলেন, ‘মুমিন ব্যক্তি নম্র ও ভদ্র হয়। পক্ষান্তরে পাপী মানুষ ধূর্ত ও চরিত্রহীন হয়।’ (তিরমিযী)

বিশ্বনবি (সা.)-এর চরিত্রে বিনয় ও নম্রতার অনন্য দৃষ্টান্ত

বিশ্বনবি মুহাম্মাদ (সা.) ছিলেন বিনয় ও নম্রতার অনন্য প্রতীক। চরম বিপদেও তাঁর মাঝে ফুটে উঠতো বিনয় ও নম্রতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁর বিনয় ও নম্রতার কারণে তাঁকে কুরআন মাজিদে কোমল হৃদয়ের অধিকারী হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। (সূরা আলে-ইমরান, আয়াত: ১৫৯) তিনি ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল। তিনি তবুও গর্ব-অহংকার পছন্দ করতেন না। তিনি বলেন, ‘কিয়ামতের দিন আমি বনি আদমের নেতা হবো, তবে এতে আমার কোনো গর্ব নেই। আমার হাতে প্রশংসার ঝান্ডা থাকবে, এতেও আমার কোনো গর্ব নেই। সেদিন আদম (আ.) সহ সকল নবি-রাসুল আমার ঝান্ডার নিচে সমবেত হবেন এবং আমিই সর্বপ্রথম যমীন থেকে উত্থিত হব, এতেও আমার কোন গর্ব নেই।’ (তিরমিযী)

আমাদের প্রিয়নবি মুহাম্মাদ (সা.)-এর বিনয় ও মহানুভবতা কত উঁচু মানের ছিল তা একটি ঘটনা থেকে অনুধাবন করা যাবে। ঘটনাটি ছিল এমন-

একবার প্রিয়নবি (সা.) ইয়াহুদি ধর্মযাজক যায়েদ ইবনে সানাহ-এর নিকট থেকে কিছু ধার নিয়েছিলেন। ধার পরিশোধের সময় তিনদিন বাকি থাকতেই সে ইয়াহুদি ব্যক্তি বিশ্বনবি (সা.)-এর কাপড় টেনে ধরে। এ সময় রাসুলুল্লাহ (সা.) হযরত উমর (রা.) কে সঙ্গে নিয়ে হাঁটছিলেন। সে বলে ওঠে, 'তোমরা বনি আবদুল মুত্তালিবের বংশধর; ঋণ পরিশোধে বড়ই টালবাহানা করছ!' হযরত উমর (রা.)-এর মতো একজন বীরের সামনে প্রিয় নবির সঙ্গে ইয়াহুদির এমন আচরণ তিনি সহ্য করতে পারেননি! রাগে গর্জে ওঠেন তিনি। হযরত উমর (রা.) এর রাগ ও গর্জন দেখে প্রিয়নবি (সা.) হাসলেন এবং কোমল কণ্ঠে বললেন, হে উমর! এ মানুষটি তোমার কাছে উত্তম আচরণ পাওয়ার যোগ্য ছিল। কেননা, আমি এবং সে দুজনই তোমার কাছে অন্য কিছুর আশা করছিলাম। তাহলো এই যে, তুমি আমাকে সুন্দরভাবে ঋণ পরিশোধ করতে বলবে এবং তাকেও ভদ্রোচিতভাবে পাওনা চাইতে পরামর্শ দিবে। পরক্ষণেই প্রিয়নবি (সা.) জানালেন যে, আসলে ঋণ পরিশোধের সময় এখনও তিন দিন বাকি। তারপর তিনি উমর (রা.) কে নির্দেশ দিলেন, 'তার পাওনা পরিশোধ করে দাও এবং এ তিন দিনের হিসেবে তাকে আরও ৩০ সা পরিমাণ বাড়িয়ে দাও।'রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর এ মহানুভবতা ইয়াহুদির মনে দাগ কাটল। ইয়াহুদি ব্যক্তি বুঝতে পারল, তার আচরণটাই অন্যায় হয়েছে। কেননা, সময়ের আগে সে পাওনা চাইতে পারে না। তাছাড়া তার পাওনা চাওয়ার ধরন এবং আচরণও খুব খারাপ ছিল। অথচ তার খারাপ আচরণের পরেও প্রিয়নবি (সা.) তার সাথে উত্তম আচরণ করলেন এবং তার পাওনা পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দিতে বললেন। এতে তার চিন্তার জগতে পরিবর্তন এলো। অবশেষে মহানবি (সা.)-এর মহানুভব আদর্শ ও বিনয়ী আচরণে বদলে গেল তার মন। ইসলাম গ্রহণ করে চিরজীবনের জন্য ধন্য হলেন তিনি।' (মুসতাদরাক আল-হাকেম)

এটি ছিল বিশ্বনবি (সা.) এর মহানুভবতা ও অনন্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। যে আদর্শ ও সৌন্দর্য দেখে ইয়াহুদি যায়েদ ইবনে সানাহ ইসলাম গ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

বিনয় ও নম্রতা মানবীয় মহৎগুণাবলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি গুণ। এগুণে গুণান্বিত ব্যক্তিকে আল্লাহ ভালোবাসেন। তাছাড়া একজন বিনয়ী ব্যক্তি সমাজে শ্রদ্ধার পাত্র হন। পাশাপাশি তিনি পরকালেও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে জান্নাত লাভে ধন্য হবেন। তাই আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ঔদ্ধত্য ও অহংকার পরিহার করে বিনয়ী ও নম্র হতে হবে।

ক্ষমা (العفو)

ক্ষমা একটি মহৎ গুণ। ক্ষমার আরবি প্রতিশব্দ আল-আফ্উ (اَلْعَفْوُ) - এর অর্থ মাফ করা, ক্ষমা করা, প্রতিশোধ গ্রহণ না করা। ইসলামের পরিভাষায় অন্যায়, অত্যাচার ও উৎপীড়নের প্রতিশোধ গ্রহণ করার পূর্ণ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিশোধ গ্রহণ না করে তার প্রতি ভ্রাতৃত্ব সহনশীলতা ও উদারতা প্রদর্শন করাই ক্ষমা।

গুরুত্ব ও তাৎপর্য

মহান আল্লাহ অত্যন্ত ভালোবেসে মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। প্রতিনিয়ত আলো-বাতাসসহ অসংখ্য নিয়ামত দিয়ে তাদের লালন-পালন করছেন। তাই তাদের দায়িত্ব হলো এ সকল নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে মহান আল্লাহর বিধি-বিধান মেনে জীবন পরিচালনা করা। কিন্তু বহুসংখ্যক মানুষ তাঁকে ও তাঁর দেওয়া জীবন বিধানকে কেবল অস্বীকার করে না বরং বিরুদ্ধাচরণ করে এবং শিরকের ন্যায় জঘন্য পাপে লিপ্ত হয়। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের ধ্বংস করে দিতে পারেন কিন্তু তা করেন না। পরে যখন নিজেদের ভুল বুঝে পাপের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা তখন ক্ষমা করে দেন। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন–

وَهُوَ الَّذِىْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَعْفُوْا عَنِ السَّيِّئَاتِ

অর্থ: 'তিনি তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং পাপসমূহ ক্ষমা করেন।' (সূরা আশ-শুরা, আয়াত: ২৫)

মহান আল্লাহ নিজে ক্ষমাশীল, তিনি ক্ষমা করতে ভালোবাসেন। তাই তিনি তাঁর প্রিয় রাসুলকে ক্ষমার আদর্শ গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন–

خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ

অর্থ: 'আপনি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন করুন, সৎকাজের নির্দেশ দিন এবং অজ্ঞদের এড়িয়ে চলুন।' (সূরা আ'রাফ, আয়াত: ১৯৯)

মহান আল্লাহর বিভিন্ন গুণাবলির অন্যতম একটি গুণ হলো ক্ষমাশীলতা। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্ন ভঙ্গিতে তাঁর 'ক্ষমা' গুণটির কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন– 'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল ও দয়ালু।' (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৭৩)
ক্ষমা নবি-রাসুলগণের একটি বিশেষ গুণ। পবিত্র কুরআনে এটিকে নবি-রাসুলগণের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

আমাদের এই মহৎ গুণটি অর্জনের প্রতি মনোনিবেশ করতে হবে। কোনো মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব বা অধীনস্থ লোকজন ভুল করলে তাদের ক্ষমা করতে হবে। হযরত আবু বকর (রা.) এর নিকট আত্মীয় ছিলেন হযরত মিসতাহ ইবনে উসাসাহ। তাকে হযরত আবু বকর (রা.) সাহায্য সহযোগিতা করতেন। এমনকি মিসতাহ আবু বকর (রা.) এর সাথে তার বাড়িতেই বসবাস করতেন। যখন মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবন উবাই হযরত আবু বকর তনয়া উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা.) এর উপর অপবাদ আরোপ করে, তখন মিসতাহও এতে অংশগ্রহণ করেন। হযরত আবু বকর (রা.) তখন মনে কষ্ট পেলেন এবং শপথ করে বসলেন আর মিসতাহকে সাহায্য করবেন না। মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে এই বিষয়টি পছন্দ হয়নি। সঙ্গে সঙ্গে আয়াত নাযিল করে আচরণের সংশোধন করার নির্দেশ দিলেন এবং ক্ষমার আদর্শ গ্রহণ করতে বললেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন–

وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا ۗ

অর্থ: 'তারা যেন তাদের ক্ষমা করে এবং দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে।' (সূরা নূর, আয়াত: ২২)

যারা ক্ষমার এই মহান গুণটি নিজেদের মধ্যে আয়ত্ত করে নেন মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দেন এবং তাদের মর্যাদাও বহুগুণ বাড়িয়ে দেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত– একবার এক লোক এসে রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলল আমাদের গোলাম ও কর্মচারীরা তো ভুল-ত্রুটি করে থাকে; তাদেরকে আমরা কতবার ক্ষমা করব? উত্তরে রাসুলুল্লাহ (সা.) কিছু না বলে চুপ রইলেন। লোকটি আবার প্রশ্ন করল। এবারও রাসুলুল্লাহ (সা.) চুপ রইলেন। লোকটি যখন তৃতীয়বার প্রশ্ন করল। তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন–

اُعْفُوْا عَنْهُ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِيْنَ مَرَّةً

অর্থ: 'প্রতিদিন তাকে সত্তর বার মাফ করে দেবে।' (আবু দাউদ)

আমাদের প্রিয়নবি (সা.) ছিলেন ক্ষমার মূর্ত প্রতীক। তিনি তাঁর চরম শত্রুকেও অবলীলায় ক্ষমা করে দিয়েছেন। ইসলাম প্রচারের জন্য তায়েফ গমন করলে সেখানকার অধিবাসীরা মহানবির প্রতি অসদাচরণ করে, পাথর মেরে শরীর রক্তাক্ত করে দেয়। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তখন হযরত জিবরাইল (আ.) পাহাড়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ফিরিশতাকে সাথে নিয়ে আসেন এবং বলেন যে, আপনি হুকুম দিলে এখনই দুই পাহাড়ের মাঝে ফেলে তাদেরকে পিষে মারা হবে। কিন্তু তিনি তাদের জন্য দোয়া করে বললেন– 'হে আল্লাহ! আমার জাতিকে হিদায়াত দান করুন। কেননা তারা জানেনা যে আমি আল্লাহর রাসুল।' মহানবি (সা.) এভাবে তায়েফবাসীদের হাসিমুখে ক্ষমা করে দেন।

একদা মহানবি (সা.) বনু গাতফানের সাথে যুদ্ধ করার জন্য মাহারিবে খাসফা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। যুদ্ধ তখনও শুরু হয়নি। কাফিরেরা মুসলমানদের অসতর্কতার সুযোগ খুঁজছিল। মহানবি (সা.) তখন একটি গাছের নিচে আরাম করছিলেন। চুপিসারে জনৈক কাফির তরবারি নিয়ে মহানবি (সা.) এর কাছে এসে বলল, এখন তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে? তিনি বললেন, আল্লাহ! তৎক্ষণাৎ তার হাত থেকে তরবারি পড়ে গেল। মহানবি তরবারিটি তুলে নিলেন এবং বললেন, এখন তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে? রাসুলুল্লাহ তাকে ক্ষমা করে ছেড়ে দিলেন। সে তার সাথিদের কাছে গিয়ে বলল, আমি সর্বোত্তম ব্যক্তির হাত থেকে মুক্তি পেয়ে তোমাদের কাছে এসেছি। (বুখারি ও মুসলিম)

রাসুলুল্লাহ (সা.) মক্কা বিজয়ের দিন ক্ষমার অনন্য নজির স্থাপন করেন। এদিন মহানবি (সা.) তার প্রাণের শত্রু মক্কার কাফির- মুশরিকদের ক্ষমা করে ঘোষণা করলেন 'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। তোমরা স্বাধীন-মুক্ত।' এ ঘোষণার পর মক্কার কাফিরেরা দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়। পৃথিবীর ইতিহাসে ক্ষমার এরূপ দৃষ্টান্ত দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া যায় না।

ক্ষমা করলে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হওয়া যায়, আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার লাভ করা যায়। সকলের সঙ্গে সুসম্পর্ক ও ভালোবাসা গভীর হয়। মহানবি (সা.) এর সুপারিশ পাওয়া যায়। মুমিনের গুণাবলি অর্জিত হয়। অপরাধী লজ্জিত হয়ে অপরাধ ছেড়ে দেয়, চরম শত্রুও বন্ধুতে পরিণত হয়। তাই আমরা জীবনের সকল ক্ষেত্রে এই মহৎ গুণের পরিচর্যা করব।

ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা

মানব চরিত্রের উত্তম গুণাবলির অন্যতম হলো ধৈর্য। ধৈর্যের আরবি প্রতিশব্দ হলো 'সবর'। এর আভিধানিক অর্থ হলো সহিষ্ণুতা, সহ্য করার ক্ষমতা, দৃঢ়তা, আত্মনিয়ন্ত্রণ, বিরত থাকা ইত্যাদি। ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর ওপর আস্থা রেখে দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর আদেশসমূহকে পালন করা। আর যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকাই হলো ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা। মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই-আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। (সূরা আল বাকারাহ, আয়াত : ১৫৩)।
হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেন, 'সবর দুই ধরনের, একটি হচ্ছে বিপদের সময় সবর করা। অপরটি হলো আল্লাহর নাফরমানি (অবাধ্যতা) থেকে বেঁচে থাকার জন্য কষ্ট সহ্য করা। (তাফসিরুল কুরআনিল আজিম) পবিত্র কুরআনুল কারিমের অনেক জায়গায় সবর শব্দটি এসেছে। যেমন মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন- 'তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধমে সাহায্য প্রার্থনা করো।' (সূরা আল বাকারা, আয়াত: ৪৫) সবর প্রসঙ্গে মহানবি (সা.) বলেছেন, 'ধৈর্য হলো একটি আলোকবর্তিকা।' (মুসলিম)

তাৎপর্য

ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও আন্তর্জাতিক পরিসরে শান্তি, স্থিতিশীলতা, সুখী ও সহাবস্থানের জন্য সবরের বিকল্প নেই। মহান আল্লাহ তা'আলা ধৈর্যশীলদের অফুরন্ত প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যেমন ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

অর্থ: 'অবশ্যই ধৈর্যশীলগণকে তাদের প্রতিদান অগণিতভাবে দেওয়া হবে।' (সূরা যুমার,আয়াত-১০)

ধৈর্য হলো সকল কল্যাণের উৎস। যেমন মহানবি (সা.) বলেছেন, 'ধৈর্যের চেয়ে বেশি প্রশস্ত ও কল্যাণকর কিছু কখনো তোমাদেরকে দান করা হবে না।' (বুখারি), আপাত দৃষ্টিতে সবর করা কঠিন হলেও এর পরিণাম সুমিষ্ট। ফারসি কবি ও দার্শনিক মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি বলেছেন, 'ধৈর্য মানে কাটার দিকে তাকিয়ে গোলাপকে দেখা। রাতের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে দিনের আলোকে দেখা।' মানুষের জীবনে সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, বিপদ-মুসিবত, সফলতা-ব্যর্থতা, জয় ও পরাজয় থাকবেই। আমরা যদি হযরত ইব্রাহিম (আ.) এর জীবনের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাব জালিম শাসক নমরুদ যখন ইব্রাহিম (আ.)-কে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিল তখন তিনি ধৈর্যহারা হননি। একইভাবে হযরত আইয়ুব (আ.) যখন কঠিন ও দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে শরীর থেকে মাংস খসে পড়েছিল, তখনও তিনি ধৈর্য না হারিয়ে মহান আল্লাহর ওপর অবিচল আস্থা রাখেন। আমাদের প্রিয় মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ছিলেন ধৈর্যের মূর্ত প্রতীক। তিনি তাঁর পবিত্র জীবনে চরম ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে নানা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

এ ছাড়া দৈনন্দিন জীবনে পালনীয় ইবাদাতের ক্ষেত্রেও সবর করতে হয়। ধৈর্য ধারণ করতে হলে প্রয়োজন দৃঢ় ইমান ও খালেস তাওয়াক্কুল (একনিষ্ঠ ভরসা)। সুতরাং আমরা জীবনের সর্বক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করব, তাহলেই আমাদের জীবন হবে সুন্দর ও সার্থক।

ওয়াদা পালন

মানবজীবনে ওয়াদা পালন একটি গুরুত্বপূর্ণ মহৎ গুণ। ওয়াদা একটি আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ প্রতিজ্ঞা করা প্রতিশ্রুতি দেওয়া, কথা দেওয়া, অঙ্গীকার করা, চুক্তি ইত্যাদি। আরবিতে এটিকে আল-আহদও (اَلْعَهْدُ) বলা হয়। আর ইসলামি পরিভাষায় কারও সাথে কোনো অঙ্গীকার করলে, কোনো প্রতিশ্রুতি দিলে অথবা কাউকে কথা দিলে বা কারও সাথে কোনো চুক্তি করলে তা সঠিকভাবে পালন করাকে ওয়াদা পালন বলা হয়।

গুরুত্ব

ওয়াদা পালন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। এটি আখলাকে হামিদাহ বা প্রশংসনীয় গুণাবলির অন্যতম গুণ। ওয়াদা রক্ষাকারীকে আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসেন। দুনিয়ায় মানুষগণও তাকে সম্মান করেন, ভালোবাসেন। সকলে তার প্রতি আস্থা রাখেন। সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকে। তাই মহান আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয় বান্দাদের ওয়াদা পালনের নির্দেশ দিয়ে বলেন,

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

অর্থ: ' হে মুমিনগণ, তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ করো।' (সুরা আল-মায়িদাহ, আয়াত: ১)

ওয়াদা বা অঙ্গীকার পালন করা আল্লাহ তা'আলার একটি গুণ। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার সাথে যখন যে ওয়াদা করেন সেগুলো তিনি যথাযথভাবে পালন করেন। তিনি কখনও ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। মহান আল্লাহ বলেন—

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ

অর্থ: 'নিশ্চয়ই আল্লাহ অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না।' (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৯)

এটি মুমিনের অন্যতম মহৎ গুণ। কেননা এই গুণ অর্জন না করলে কেউ পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারে না। মহানবি (সা.) বলেন—

لَا دِيْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهٗ

অর্থ: 'যে ওয়াদা পালন করে না, তার দ্বীনদারি নেই।' (মুসনাদে আহমাদ)

ওয়াদা পালন করা মুমিনের জন্য ঋণ পরিশোধ করার সমান। ঋণ পরিশোধ করা যেমন একান্ত বাধ্যতামূলক তেমনি ওয়াদা পূরণ করাও অনিবার্য বিষয়। মহানবি (সা.) বলেন–

عِدَةُ الْمُؤْمِنِ دَيْنٌ

অর্থ: 'মুমিনের ওয়াদা ঋণস্বরূপ।'

তাই ওয়াদা রক্ষা করার ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকতে হবে। কেয়ামতের দিন অঙ্গীকারের ব্যাপারে মহান আল্লাহর কাছে সকলকে জবাবদিহি করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন–

وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ۖ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔوْلًا

অর্থ: 'আর তোমরা ওয়াদা পূরণ করো। অবশ্যই ওয়াদার ব্যাপারে তোমাদের জিজ্ঞেস করা হবে।' (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত: ৩৪)

এখানে ওয়াদা বলতে শুধু আল্লাহর সাথে কৃত বান্দার অঙ্গীকারই নয় বরং মানুষের পারস্পরিক ওয়াদাকেও বুঝায়। পরস্পরের ওয়াদা পূর্ণ না করা মুনাফিকের লক্ষণ। আর মুনাফিকের আবাস হলো জাহান্নাম। মহানবি (সা.) বলেন– 'মুনাফিকদের লক্ষণ তিনটি: কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে আর আমানতের খেয়ানত করে।' (বুখারি)

ওয়াদা পালন নবি-রাসুলগণের অনন্য বৈশিষ্ট্য। আমাদের প্রিয়নবি (সা.) সর্বদা ওয়াদা রক্ষা করতেন। তিনি কখনো ওয়াদা ভঙ্গ করেননি। সারা জীবন তিনি যাকে যে ওয়াদা করেছেন সব ওয়াদা পালন করেছেন। তার চরম শত্রুরাও বলতে পারেনি যে, মুহাম্মাদ (সা.) ওয়াদা করে তা পালন করেনি।

তাই আমরা সবসময় ওয়াদা পালন করব। কখনো ওয়াদা ভঙ্গ করব না। এমন কোনো ওয়াদা করব না যা পালন করা কঠিন। যদি ওয়াদা করে ফেলি তাহলে প্রাণপণ চেষ্টা করব তা রক্ষা করার। তাহলে দুনিয়া ও আখিরাতে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হবে।

আমানত রক্ষা করা

যেসব উত্তম ও প্রশংসনীয় গুণাবলি মানুষকে আলোকিত ও মহান করে তোলে, আমানত রক্ষা সেগুলোর মধ্যে প্রধান ও অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি গুণ। এ গুণটি পার্থিব জগতে মানুষের সম্মান বৃদ্ধি করে। আখিরাতে মুক্তি ও অফুরন্ত কল্যাণ লাভের সহায়তা করে। রাসুলুল্লাহ (সা.) কে তাঁর এ মহৎ গুণের কারণে মক্কার কাফির-মুশরিকরা আল-আমিন উপাধিতে ভূষিত করেন।

আমানত (اَلْاَمَانَةُ)-এর আভিধানিক অর্থ

আমানত (اَلْاَمَانَةُ) আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হলো বিশ্বস্ততা, আস্থা, নিরাপত্তা ও আশ্রয় ইত্যাদি। তবে আমানত শব্দটি গচ্ছিত রাখা অর্থেই বেশি ব্যবহৃত হয়। আমানত শব্দটি আরবি হলেও আমাদের কাছে এর অর্থ অনেক পরিচিত। আমানতের বিপরীত অর্থ খিয়ানত করা। কোনো অর্থ-সম্পদ, বস্তু-সামগ্রী অন্য কারও কাছে গচ্ছিত রাখাকে আমরা আমানত বুঝি। গচ্ছিত রাখা বস্তু বা সম্পদ তার মালিকের কাছে সযত্নে যথাযথভাবে ফিরিয়ে দেওয়াই আমানত রক্ষা করা। যে আমানতের সংরক্ষণ করে এবং তা যথাযথভাবে ফিরিয়ে দেয়, তাকে আল-আমিন বলা হয়।

আমানত ব্যাপক অর্থবোধক একটি বিষয়। আমাদের জীবনের প্রতিটি পর্যায়েই আমানত রয়েছে। কথায়, কাজে, পরামর্শে, গোপনীয়তা রক্ষায়, ইবাদাতে, চাকুরিতে, নেতৃত্ব ও পদমর্যাদায় আমানত রয়েছে। আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও আমানত রয়েছে। জীবনের সর্বস্তরে যথযথভাবে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই এ আমানত পালন করা সম্ভব হবে।

আমানতের গুরুত্ব

আমানত রক্ষা করা একটি মহৎ গুণ। সমাজজীবনে আমানত রক্ষা করার গুরুত্ব অনেক। আমানত রক্ষাকারীকে সমাজের সবাই ভালোবাসে ও বিশ্বাস করে। আর খিয়ানতকারীকে সমাজের কেউ ভালোবাসে না, বিশ্বাসও করে না বরং সবাই তাকে ঘৃণা করে। তাই আমানত রক্ষা করার জন্য কুরআন মাজিদ ও রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাদিসে তাগিদ দেওয়া হয়েছে। কুরআন মাজিদে আমানত রক্ষা প্রসঙ্গে ইরশাদ হচ্ছে,

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمَانَاتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا

অর্থ: ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা যেন আমানতসমূহ তার মালিকের কাছে যথাযথভাবে পৌঁছে দাও।’ (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৫৮)।

আমানত রক্ষা করা প্রকৃত মুমিনের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যারা আমানতের খেয়ানত করে না এবং ওয়াদা রক্ষা করে তারাই প্রকৃত ইমানদার। এটি ইমানের অন্যতম মৌলিক ভিত্তি। তাই যার মধ্যে আমানতদারিতা নেই তার মধ্যে ইমান থাকে না। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهٗ

অর্থ: 'যার মধ্যে আমানতদারি নেই, তার ইমানও নেই।' (মুসনাদে আহমদ)

আমানত রক্ষা করা যেমন মুমিনের বৈশিষ্ট্য, তেমনি আমানত খিয়ানত করা মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য। মহানবি (সা.) মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা দিয়ে বলেন,

اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

অর্থ: 'মুনাফিকের আলামত বা বৈশিষ্ট্য তিনটি : ১. যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে; ২. যখন ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে এবং ৩. যখন তার কাছে কিছু আমানত রাখা হয়, তখন সে তা খিয়ানত করে।' (বুখারি ও মুসলিম)

আমানত রক্ষাকারী ব্যক্তি হাশরের ময়দানে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত হবেন। তাই পরকালে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ও সাফল্য লাভ করতে হলে আল্লাহ তা'আলার দেওয়া আমানতের হিফাজত করতে হবে।

কেউ প্রকৃত ইমানদার হতে পারে না, যতক্ষণ না তার মধ্যে আমানতদারিতা থাকে। তাই প্রকৃত মুমিনের দায়িত্ব হচ্ছে, কিছুতেই আমানতের খেয়ানত না করা। এমনকি খেয়ানতকারীর আমানতও নষ্ট করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে মহানবি (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি তোমার নিকট আমানত রেখেছে; তার আমানত তাকে ফেরত দাও। আর যে ব্যক্তি তোমার আমানত খেয়ানত করেছে তার আমানতও খেয়ানত করো না।' (আবু দাউদ)। অতএব কোনো কারণেই আমানতের খেয়ানত করা যাবে না।

মহানবি মুহাম্মাদ (সা.)-এর আমানতদারিতা

মহানবি (সা.) ছিলেন তৎকালীন আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ আমানতদার। তাঁর কাছে শুধু মুসলমান নয়; মক্কার কাফির, মুশরিকসহ অন্যান্য ধর্মের লোকেরা তাদের মূল্যবান ধনসম্পদ আমানত রাখত। তিনি মানুষের কাছে এতটাই বিশ্বাসী ছিলেন যে, তারা তাঁর কাছে টাকা-পয়সা এমনকি স্বর্ণালংকার ও নামীদামি জিনিসপত্র আমানত রেখে যেতে শঙ্কাবোধ করত না। তারা যেভাবে রেখে যেত, ঠিক সেভাবেই তিনি তাদের আমানত ফিরিয়ে দিতেন। তাঁর চরম শত্রুও তাঁর কাছে আমানত রাখতে দ্বিধা করত না। তাঁর এ আমানতদারিতার জন্য মক্কাবাসী তাঁকে আল-আমিন বা বিশ্বাসী উপাধিতে ভূষিত করেন।

নবুয়তের পরে মক্কার কাফির-মুশরিকরা যখন তাকে চরম নির্যাতন করতে থাকে, এমনকি তাঁকে হত্যার পরিকল্পনাও করে। তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে যে রাতে নবিজি মদিনার পথে হিজরত করেছিলেন, সে রাতেও নিজের কাছে রাখা তাদের সংরক্ষিত আমানত তিনি হযরত আলী (রা.)-এর কাছে রেখে গিয়েছিলেন। যাতে তিনি প্রাপ্য ব্যক্তিদের কাছে তাদের আমানত যথাযথভাবে পৌঁছে দিতে পারেন। (সুনানুল কুবরা-বায়হাকি) আমানতদারিতা একটি মহৎ গুণ। আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমানত রক্ষায় সচেষ্ট থাকব। কারও কোনো আমানতের খেয়ানত করব না।

শিষ্টাচার

শিষ্টাচার মনুষ্যত্ববোধের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। যে সব গুণ মানব চরিত্রকে সুন্দর, আকর্ষণীয় ও গৌরবান্বিত করে তোলে তার মধ্যে শিষ্টাচার অন্যতম। এটি মানব চরিত্রের উন্নয়ন ঘটায় এবং ব্যক্তিকে সমাজে সম্মানিত করে।

শিষ্টাচার (الأدب)-এর অর্থ

শিষ্টাচার শব্দটি শিষ্ট ও আচার শব্দদ্বয়ের সমন্বিত রূপ। সাধারণত শিষ্ট অর্থ-শান্ত, ভদ্র, সুশীল, সুবোধ, বিনয়ী, মার্জিত, নীতিবান। আর আচার অর্থ ব্যবহার, আচার-ব্যবহার, চালচলন, প্রথা ইত্যাদি। অতএব শিষ্টাচার অর্থ ভদ্র ব্যবহার ও নম্র আচরণ। মানুষের কথাবার্তা, চাল-চলন ও আচার-আচরণে যে ভদ্রভাব, সৌজন্য ও শালীনতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে তা-ই শিষ্টাচার বা আদব।

শিষ্টাচারের গুরুত্ব

শিষ্টাচার মানব চরিত্রের একটি মহৎ গুণ ও সৌন্দর্যের প্রতীক। সাধারণত শিষ্টাচারের মাধ্যমে মানুষের ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে। এটি সম্প্রীতি ও সৌহার্দের চাবিকাঠি। এর বিপরীতে অশোভন ও অশালীন আচার-ব্যবহার ও পোশাক-পরিচ্ছদ সমাজের বিপর্যয় ডেকে আনে। সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করে ও নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয় ঘটায়। তাই সমাজকে সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ রাখতে শিষ্টাচারের প্রয়োজনীয়তা অনেক।

মানুষের কথাবার্তা, আচার-ব্যবহার ও পোশাক-পরিচ্ছদ হওয়া উচিত মার্জিত, রুচিসম্মত ও ভারসাম্যপূর্ণ। কথা ও কাজে যেন কারো প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য প্রকাশ না পায় এবং নিজের গর্ব প্রকাশিত না হয় সেদিকে লক্ষ রাখা উচিত। মহান আল্লাহ বলেন, 'অহংকার বশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে গর্বভরে পদচারণা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ কোন দাম্ভিক অহংকারীকে ভালোবাসেন না।'(সূরা লোকমান, আয়াত: ১৮)

মহানবি (সা.)-এর শিষ্টাচার

মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ছিলেন শিষ্টাচারের অনুপম আদর্শ। বহু কাফির, মুশরিক রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর শিষ্টাচার, সুন্দর ব্যবহার ও মহানুভবতায় মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। একটি ঘটনা থেকে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর মহানুভবতা ও অনন্য শিষ্টাচারের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ঘটনাটি ছিল এমন—একবার এক আরব বেদুঈন মসজিদে প্রস্রাব করে দিল। তখন লোকজন তাকে শাসন করার জন্য উত্তেজিত হয়ে পড়ল। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাদেরকে বললেন, তাকে প্রস্রাব করতে দাও এবং তার প্রস্রাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও। কারণ তোমাদেরকে নম্র ব্যবহারকারী হিসাবে পাঠানো হয়েছে, কঠোর ব্যবহারকারী হিসেবে নয়। (বুখারি ও মুসলিম) প্রস্রাব শেষ করার পরে রাসুলুল্লাহ (সা.) তাকে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বললেন, তখন সে বুঝতে পারল এটা তার ভুল ছিল। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর অভূতপূর্ব শিষ্টাচারে বেদুঈন ব্যক্তি এতটাই বিমুগ্ধ হলো যে, সঙ্গে সঙ্গে সে ইসলাম গ্রহণ করল।

রাসুলুল্লাহ (সা.) মিষ্টভাষী ছিলেন। সব সময় হাসিমুখে থাকতেন এবং মানুষের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলতেন। কদর্যতা কিংবা রূঢ়তা তাঁর ভাষায় ছিল না। তিনি কখনো মুখ কালো করে থাকতেন না। ইবনে হারেস (রা.) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.) অপেক্ষা অধিক মুচকি হাসতে আর কাউকে দেখিনি। (মুসনাদে আহমদ)

তিনি ছোটদের আদর করতেন এবং বড়দের সম্মান করতেন। সাক্ষাতে ছোট-বড় সবাইকে সালাম দিতেন, তাদের খোঁজ-খবর নিতেন। আনাস (রা.) বলেন, একদা আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে ছিলাম। তখন রাসুললুল্লাহ (সা.) কয়েকটি শিশুকে অতিক্রম করছিলেন এবং তাদেরকে সালাম করলেন। (মুসলিম)

আমরা কথাবার্তা ও আচার-আচরণে সংযত হবো, উত্তম ভাষায় মার্জিত ভঙ্গিতে কথা বলব। অহেতুক মিথ্যাচার, অপবাদ, দোষারোপ করা থেকে দূরে থাকব। সর্বোপরি কথাবার্তা, কাজকর্ম ও আচার-আচরণে শিষ্টাচার বজায় রাখব।

নিজের কাজ নিজে করার গুরুত্ব

আমরা দৈনন্দিন জীবনে যা করি, তা-ই কাজ। সাধারণত দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন কাজ আমরা নিজেরাই করে থাকি। পৃথিবীর সকল মহামানব, নবি, রাসুল ও বিখ্যাত মনীষী নিজেদের কাজ নিজেরাই করতেন। অন্যরা করে দিতে চাইলেও তাঁরা তা করতে দিতেন না। নিজের কাজ নিজে করলে পছন্দমতো কাজ করা যায়, সময় বাঁচে, অর্থের সাশ্রয় হয় এবং কাজ সুন্দর হয়। নিজের কাজ অন্যে করলে সে কাজের গুরুত্ব কমে যায়। তা ছাড়া কাজ করলে শরীর ও মন দু'টিই ভালো থাকে। আর শরীর ও মন ভালো থাকলে লেখাপড়ায় মন বসে। প্রত্যহ নিজের কাজ নিজে করার মাধ্যমে আরো অনেক সুবিধা পাওয়া যায়।

ইসলামের দৃষ্টিতে কাজ করার শক্তি ও যোগ্যতা হলো মহান আল্লাহর এক পবিত্র আমানত। মানুষ কাজ করার এ শক্তিকে ব্যবহার করে নিজের ও সমাজের উন্নয়ন ও পরিবর্তন ঘটায়। কাজই মানুষের সফলতার মূল চাবিকাঠি। যারা চেষ্টা-সাধনা ও কাজ করে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সফলতার পথ সুগম করে দেন। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

অর্থ: 'নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তন করেন না; যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করেন।' (সূরা রা'দ, আয়াত: ১১)

জীবিকা নির্বাহের জন্য বৈধ কাজ করা একটি ইবাদাত। মহানবি (সা.) বলেন,

طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ

অর্থ: 'ফরয ইবাদতের পর হালাল রুজি উপার্জন করা একটি ফরয ইবাদাত।' (বায়হাকি)

মহানবি (সা.) আরও বলেন,

مَا اَكَلَ اَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ اَنْ يَاْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهٖ

অর্থ: 'কোনো ব্যক্তি নিজ হাতে উপার্জিত সম্পদের চাইতে উত্তম কিছু খাদ্য হিসেবে কখনও খায় না।' (বুখারি)

ইসলামে শ্রম ও শ্রম বিনিয়োগকারীর গুরুত্ব অনেক বেশি। রাসুলুল্লাহ (সা.) শ্রমিকের মজুরি কাজের সাথে সাথে আদায় করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। মহানবি (সা.) বলেন, মজুরের শরীরের ঘাম শুকানোর আগেই তার মজুরি আদায়ে করে দেবে। (বায়হাকি) শ্রমজীবীর মযার্দা সম্পর্কে মহানবি (সা.) আরও বলেন,

اَلْكَاسِبُ حَبِيْبُ اللهِ

অর্থ: 'শ্রমজীবী আল্লাহর বন্ধু।' (বায়হাকী)

মহানবি (সা.) ও অন্যান্য নবিগণ কতৃর্ক নিজের কাজ নিজে করার দৃষ্টান্ত

মহামানবগণ নিজেদের কাজ নিজেরা করতে ভালোবাসতেন। আমাদের প্রিয়নবি (সা.) সর্বদা নিজের কাজ নিজে করতেন; এতে কোনো ধরনের লজ্জাবোধ করতেন না। তিনি কঠোর পরিশ্রমে অভ্যস্ত ছিলেন। ছোটবেলায় তিনি পশু চরাতেন; বড় হয়ে ব্যবসা পরিচালনা করতেন। নিজেই বকরির দুধ দোহন করতেন, নিজের জুতা নিজেই সেলাই করতেন, নিজের কাপড়-চোপড় নিজেই ধুয়ে নিতেন। ইসলামের জন্য বিভিন্ন যুদ্ধে তিনি নেতৃত্ব দিতেন; খন্দকের যুদ্ধে পরিখা খননে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। হাদিসে বলা হয়েছে, প্রত্যেক নবি-রাসুলই বকরি চরিয়েছেন। এমনকি রাসুলুল্লাহ (সা.) ও কতিপয় মুদ্রার বিনিময়ে মক্কাবাসীর বকরি চরাতেন। (বুখারি)। ইবনে হিশাম উল্লেখ করেছেন যে, তরুণ বয়সে রাসুলুল্লাহ (সা.) বনি সাদ গোত্রের বকরি চরাতেন। (সীরাতে ইবনে হিশাম)

রাসুলুল্লাহ (সা.) গৃহস্থালি কাজেও স্ত্রীদের সাহায্য করতেন। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) কি ঘরের কাজকর্ম করতেন? তিনি জবাবে বললেন, 'হ্যাঁ, রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর নিজের জুতা নিজে সেলাই করতেন, পট্টি লাগাতেন। নিজের কাপড় সেলাই করতেন। তোমাদের কেউ যেমন নিজের ঘরে কাজ করে, তেমনি তিনি নিজের ঘরে কাজ করতেন।' (মুসনাদে আহমদ)

পৃথিবীতে নবি-রাসুলগণ ছিলেন শ্রেষ্ঠ মানুষ। তাঁরা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ ও মর্যাদাপ্রাপ্ত ছিলেন। তারপরেও তাঁরা সকলেই নিজেদের কাজ নিজেরা করতেন। পরিশ্রম করে উপার্জন করতেন। মুসতাদরাক আল-হাকিম গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, হযরত দাউদ (আ.) যুদ্ধের পোশাক, লোহার অস্ত্র ও তৈজসপত্র প্রস্তুতকারী ছিলেন। হযরত আদম (আ.) দরজি, মূসা (আ.) কৃষক, নূহ (আ.) ছুতার এবং ইদ্রীস (আ.) দরজি ছিলেন। সুতরাং কোনো কাজকে তুচ্ছ করা যাবে না। শ্রমিককে সম্মান করতে হবে, তাকে অবহেলা বা ছোট করে দেখা যাবে না।

আমরা সবাই নিজেদের কাজ নিজেরা করব। ঘরের কাজে বাবা-মাকে সাহায্য করব। আমাদের জামা-কাপড় পরিষ্কার করা, পড়ার টেবিল গুছিয়ে রাখা ইত্যাদি সকল কাজই নিজেরা করব। এর মাধ্যমে আমরা সুস্থ-সবল, কর্মঠ, আত্মবিশ্বাসী ও প্রত্যয়ী হব।

পরোপকার

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে কেউ একা চলতে পারে না। সমাজের প্রত্যেক মানুষ একে অপরের প্রতি নির্ভরশীল। সমাজে বসবাসরত প্রত্যেক মানুষ পরস্পরের সাথে মিলেমিশে বসবাস করে। সুখ-দুঃখ পরস্পর ভাগ করে নেয়। মানবিকতার দাবিতে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য-সহযোগিতা করতে হয়। এভাবে একে অন্যের প্রয়োজনে বা উপকারে আসার নামই পরোপকার।

পরোপকারকে আরবিতে ইহসান (الْإِحْسَانُ) বলা হয়। এটি হসনুন (حُسْنٌ)মূলধাতু থেকে নির্গত। হসনুন শব্দের অর্থ সুন্দর বা সৌন্দর্য। সুন্দর ব্যবহার করা, উপকার করা, কষ্ট লাঘব করা, কোনো কাজ সুন্দরভাবে এবং উত্তমরূপে সম্পন্ন করার নাম ইহসান। মোটকথা, সৃষ্টির প্রতি মানুষের যে দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে, তা নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার সাথে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পালন করাকে ইসলামের পরিভাষায় ইহসান বা পরোপকার বলা হয়।

গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ইহসান বা পরোপকার মহান আল্লাহর একটি গুণ। তাই সৃষ্টির সেরা মানুষের মধ্যে তিনি এ গুণটির বিকাশ দেখতে পছন্দ করেন। পরোপকার মানুষের মর্যাদার মাপকাঠি। মানবজাতির শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি। মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের বের করা হয়েছে। তোমরা ভালো কাজের নির্দেশ দেবে এবং মন্দ কাজে বাধা দেবে।'(সুরা আলে-ইমরান, আয়াত: ১১০)
পরোপকার মানব চরিত্রের অমূল্য সম্পদ। এর মাধ্যমে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। পরোপকারী লোকদের আল্লাহ অধিক ভালোবাসেন ও পছন্দ করেন। মহান আল্লাহ বলেন—

وَاَحْسِنُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

অর্থ: 'আর তোমরা সৎকাজ ও পরোপকার করো, নিশ্চয় আল্লাহ সৎ কর্মপরায়ণ ও পরোপকারী লোকদের ভালোবাসেন।' (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৯৫)

আল্লাহ আরও বলেন–

وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ

অর্থ: 'অবশ্যই আল্লাহ ইহসানকারী তথা পরোপকারীদের সাথে থাকেন।' (সূরা আল-আনকাবূত, আয়াত: ৬৯)

পরোপকার দ্বারা কেবল অন্যেরই কল্যাণ হয় তা নয়; বরং পরোপকারে নিজেরও কল্যাণ সাধিত হয়। কারণ, পরোপকার করলে পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি ও ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। যাদের উপকার করা হয় তারা কৃতজ্ঞ হয়। তার কোনো ক্ষতি করে না। ফলে তার জীবন নিরাপদ ও শান্তিময় হয়। মহান আল্লাহ বলেন–

اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ ۖ وَاِنْ اَسَاْتُمْ فَلَهَا

অর্থ: 'তোমরা যদি অন্যের উপকার করো, তাহলে তা নিজেদেরই জন্য করলে, আর যদি অপকার করো, তাহলে তাও করবে নিজেদেরই জন্য।' (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত: ৭)

ইহসান তথা পরোপকারের দ্বারা সহজে মানুষের হৃদয় জয় করা যায়। চরম শত্রুও বন্ধুতে পরিণত হয়। সমাজে শান্তি, শৃঙ্খলা ও সৌহার্দ প্রতিষ্ঠা হয়।

পরোপকার মানুষকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। পৃথিবীর ইতিহাসে যেসব মহামনীষী স্মরণীয় হয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেকেই ছিলেন পরহিতৈষী। আমাদের মহানবি (সা.) ছিলেন পরোপকারের মূর্ত প্রতীক। তিনি নিজে সব সময় মানুষের উপকার করতেন। অন্যকেও উপদেশ দিতেন মানুষের উপকার করতে। তিনি বলেন– 'তোমরা দুনিয়ার অধিবাসীদের প্রতি দয়া করো, তাহলে আসমানের অধিপতি মহান আল্লাহও তোমাদের প্রতি দয়া অনুগ্রহ করবেন।' (তিরমিযি)

মহানবি (সা.) আরও বলেন, 'যে ব্যক্তি দুনিয়ায় কোনো মুমিনের একটি সমস্যার সমাধান করবে, আল্লাহ আখেরাতে তার বিপদ থেকে একটি বিপদ দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোনো অভাবগ্রস্তের অভাব দূর করবে, আল্লাহ তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে স্বাচ্ছন্দ্য দান করবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষ গোপন করবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ গোপন করবেন। আল্লাহ বান্দার সাহায্যে থাকেন, যতক্ষণ সে তার ভাইয়ের সাহায্যে নিয়োজিত থাকে।' (মুসলিম)

সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহর পরিবার। ধনী-গরিব, ছোট-বড়, আত্মীয়-আত্মীয়, মুসলিম-অমুসলিম, জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের কল্যাণ করা, উপকার করা আমাদের কর্তব্য। আমরা সকল সৃষ্টির প্রতি যথাযথ কর্তব্য পালন করব। বিপদে এগিয়ে আসব। অন্যের উপকার করব। তাহলেই আল্লাহ আমাদের কল্যাণ করবেন।

দলগত কাজ: শিক্ষার্থীরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে পরোপকারের সুফল আলোচনা করবে।

সৃষ্টির সেবা

সৃষ্টির সেবা করা একটি মহৎ গুণ। ইসলামি পরিভাষায় সৃষ্টির সেবাকে খিদমাতুল খালক (خِدْمَةُ الْخَلْقِ) বলা হয়। আরবি খিদমত শব্দের অর্থ সেবা করা আর খালক শব্দের অর্থ সৃষ্টি। সুতরাং খিদমতে খালক অর্থ সৃষ্টির সেবা করা। মহান আল্লাহর সকল সৃষ্টির প্রতি দয়া ও সহানুভূতিশীল হয়ে সেবা-যত্ন, লালন-পালন, সংরক্ষণ ও সহায়তা করাকে খিদমতে খালক বা সৃষ্টির সেবা বলে।

মানুষ যেমন মহান আল্লাহর সৃষ্টি, তেমনি পশু-পাখি, জীব-জন্তু, গাছ-পালা, কীট-পতঙ্গ, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, আলো-বাতাস, জড় ও অচেতন পদার্থ সব কিছুই আল্লাহর সৃষ্টি। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ইবাদাতের জন্য আর অন্যসব কিছু সৃষ্টি করেছেন তাঁর সেরা সৃষ্টি মানুষের কল্যাণের জন্য। তাই অন্যান্য সৃষ্টির কল্যাণ ও যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করা মানুষের একান্ত কর্তব্য।

গুরুত্ব

সৃষ্টির সেবা করা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। সৃষ্টির সেবা করলে বা সৃষ্টির প্রতি সদয় আচরণ ও সহানুভূতি প্রদর্শন করলে মহান আল্লাহ অত্যন্ত খুশি হন। তিনি তাদের দয়া করেন, অনুগ্রহ দান করেন। মহানবি (সা.) বলেন–

اِرْحَمُوْا مَنْ فِي الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ

অর্থ: ‘তোমরা পৃথিবীবাসীদের প্রতি দয়া করো, তাহলে আসমানের অধিপতি মহান আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।’ (তিরমিযি)

সৃষ্টিকুলকে যে ভালোবাসে, আদর-যত্ন করে মহান আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন। প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টিকুলের প্রতি ভালোবাসার উপরই আল্লাহর ভালোবাসা নির্ভর করে। কারণ, সমগ্র সৃষ্টিই মহান আল্লাহর পরিজন। জিন-ইনসান, জীব-জন্তু, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ এ সব নিয়ে মহান আল্লাহর এক বিশাল সৃষ্টি পরিবার। এসব সৃষ্টির লালন-পালন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যা করা মানুষের কর্তব্য। এতে মহান আল্লাহ সন্তুষ্ট হন ও তার প্রিয়ভাজন হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করা যায় । আর এ-সব সৃষ্টির প্রতি রূঢ় আচরণ ও দায়িত্ব পালন না করলে তিনি অখুশি হন। তাঁর ভালোবাসা থেকে মানুষ বঞ্চিত হয়। এ প্রসঙ্গে মহানবি (সা.) বলেন–

اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللهِ فَاَحَبُّ الْخَلْقِ اِلَى اللهِ مَنْ اَحْسَنَ اِلٰى عِيَالِهٖ

অর্থ: 'সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর পরিজন। আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তিই প্রিয়, যে তার পরিজনের প্রতি বেশি অনুগ্রহশীল।' (বায়হাকি)

সৃষ্টির সেবা করার মাধ্যমেই যেমনি পরকালীন মুক্তি ও শান্তি লাভ করা সম্ভব তেমনি এর ওপরই মহান আল্লাহর অনুগ্রহ নির্ভর করে। মহানবি (সা.) বলেন–

لَايَرْحَمُ اللهُ مَنْ لَايَرْحَمُ النَّاسَ

অর্থ : 'যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে না, আল্লাহ তার প্রতি দয়া করেন না।' (বুখারি)

আমাদের সমাজের অসহায়, দরিদ্র, দুস্থ, অসুস্থ, রুগ্ণ ও আশ্রয়হীন অনেক মানুষ আছে। আমাদের দায়িত্ব অসহায়, দরিদ্র ও দুস্থদের সাহায্য- সহায়তা করা। অসুস্থ ও রুগ্ণদের সেবা-শুশ্রূষা করা, তাদের ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থা করা। আশ্রয়হীনদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এসব দায়িত্ব পালন করব ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ আমাদের সাহায্য করবেন। এ প্রসঙ্গে মহানবি (সা.) বলেন–

وَاللهُ فِىْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِىْ عَوْنِ اَخِيْهِ

অর্থ: 'বান্দা যতক্ষণ তার ভাইয়ের সাহায্যে রত থাকে, আল্লাহ ততক্ষণ তার বান্দার সাহায্যে রত থাকেন।' (মুসলিম)

সৃষ্টি জীবের প্রতি দয়া করলে মহান আল্লাহ যে কত খুশি হন তা নিচের হাদিসটি দ্বারা বোঝা যায়। মহানবি (সা.) বলেছেন, হযরত মূসা (আ.) এর সময়ে একজন পাপী মহিলা ছিল। সে সব সময়ই পাপের কাজে লিপ্ত থাকত। কখনও কোনো ভালো কাজ করত না। একদিন দুপুর বেলা মহিলাটি একটি কূপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। কূপের পাশে একটি পিপাসার্ত কুকুর পিপাসায় ছটফট করছিল। কুকুরটিকে দেখে মহিলার খুব মায়া হলো। সে তার পায়ের মোজা খুলে ফেলল। তারপর সেটি কূপের পানিতে ভিজিয়ে পানি নিয়ে কুকুরটিকে পান করালো। কুকুরের পিপাসা মিটে গেল। মহিলার এই কাজটি আল্লাহ তা'আলা খুব পছন্দ করলেন এবং তার সব অপরাধ ক্ষমা করে দিলেন। (বুখারি)

মানুষ ছাড়া অন্যান্য সৃষ্টির প্রতিও মানুষের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। জীব-জন্তু, পশু-পাখি, কুকুর-বিড়াল, গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি প্রভৃতি প্রাণীর আমাদের মতো ক্ষুধা ও পিপাসা আছে। তাদের প্রতি আমাদের সদয় আচরণ করতে হবে। খাদ্য ও পানীয়র ব্যবস্থা করতে হবে। কোনোভাবেই এগুলোকে কষ্ট দেওয়া যাবে না। এগুলোকে কষ্ট দিলে মহান আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। পশু-পাখিকে কষ্ট দেওয়া মারাত্মক পাপের কাজ। হাদিসে আছে– রাসুল (সা.) বলেছেন, একজন মহিলা একটি বিড়ালকে আটকে রেখেছিল। এমনকি সে বিড়ালটিকে ছেড়েও রাখেনি যে সে পোকা-মাকড় খেয়ে বেঁচে থাকবে। খাবার না পেয়ে একদিন বিড়ালটি মারা গেল। রাসুল (সা.) বললেন, এই বিড়ালের কারণে মহিলাটি জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে।

আমাদের পরিবেশে জীব-জন্তুর সাথে গাছ-পালা, লতা-পাতা, কীট-পতঙ্গ, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, আগুন-পানি ও বায়ু বিদ্যমান। এগুলোর দ্বারা মহান আল্লাহ আমাদের জন্য পরিবেশকে ভারসাম্যপূর্ণ করে সৃষ্টি করেছেন। জীব-জন্তুর সাথে সাথে এগুলোর প্রতিও আমাদের সদয় আচরণ করতে হবে। মহানবি (সা.) যেমন বৃক্ষ রোপণ ও ফসল উৎপাদনের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন, তেমনি তা সংরক্ষণের প্রতিও তাগিদ করেছেন। অকারণে গাছ কাটা যাবে না। মহানবি (সা.) যুদ্ধাবস্থায়ও বৃক্ষ নিধন ও ফসল বিনষ্ট করতে নিষেধ করেছেন।

মোটকথা ইসলাম মানুষের সেবা ও খেদমতের জন্য, সমাজের উপকারের জন্য নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে উদ্বুদ্ধ করে। আল্লাহর সকল সৃষ্টির সেবাদানের প্রতি অনুপ্রাণিত করে। আমরা সৃষ্টির সেবা করব। সৃষ্টিকুলের প্রতি সদয় আচরণ করব। কোনো জীব-জন্তুকে কষ্ট দেব না। পরিবেশ সংরক্ষণে যত্নবান হব।

আখলাকে যামিমাহ (নিন্দনীয় চরিত্র)

আখলাকে যামিমাহ অর্থ নিন্দনীয় চরিত্র বা মন্দ চরিত্র। মানুষের চরিত্রের খারাপ ও বর্জনীয় দিকগুলোই হলো আখলাকে যামিমাহ। মিথ্যাচার, প্রতারণা, ক্রোধ, লোভ লালসা, পরনিন্দা, মানুষকে কষ্ট দেয়া প্রভৃতি আখলাকে যামিমাহ-এর উদাহরণ । প্রিয় শিক্ষার্থী, চলো আমরা মানুষের নিন্দনীয় চরিত্র বা বর্জনীয় আচরণসমূহ সম্পর্কে জেনে নিই।

মানুষকে কষ্ট দেওয়া

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। আল কুরআনের ভাষায় মহান আল্লাহ তা'আলা বনী আদম তথা সকল মানুষকে সম্মানিত করেছেন। তাই কোনো মানুষকে অসম্মান করা মূলত মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ। এই অপরাধ দুইভাবে হয়ে থাকে।

১. কথার মাধ্যমে
২. কাজের মাধ্যমে

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে পীড়া দেয়, এমন কোনো অপরাধের জন্য যা তারা করেনি; তারা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে।' (সূরা আহযাব' আয়াত: ৫৮)

আমরা যদি আমাদের সমাজব্যবস্থার দিকে তাকাই, তাহলে দেখতে পাব মানুষ প্রতিনিয়ত ইচ্ছা-অনিচ্ছায় এ-জাতীয় পাপের সাথে জড়িত হচ্ছে। কথার মাধ্যমে কষ্ট দেওয়া বলতে বোঝায় কাউকে গালি দেওয়া, গিবত তথা পরনিন্দা করা, অপবাদ দেওয়া, ব্যাঙ্গ করা, খোঁটা দেওয়া ইত্যাদি।
কাজের মাধ্যমে কষ্ট দেওয়া বলতে বোঝায় প্রতারণা, জুলুম, রাস্তা বন্ধ করা, দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান, সম্পদ জবরদখল, শত্রুতা পোষণ, হত্যা করা, লেখনী ও ফেসবুকে অসম্মানজনক কথা লেখা ইত্যাদি।

এসব কথা ও কাজের মাধ্যমে মানুষকে মূলত কষ্ট দেওয়া হয়। অথচ মহানবি (সা.) বলেছেন, 'মুসলমান হলো সেই ব্যক্তি যার জিহবা ও হাত থেকে অপর মুসলমান নিরাপদে থাকে।' (বুখারি) তাই প্রকৃত মুসলমান হতে হলে অপর মুসলমানকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা প্রয়োজন। এ ছাড়া মানুষের কষ্ট দূর করাকে হাদিসে ঈমানের অঙ্গ বলা হয়েছে। রাসুল (সা.) বলেছেন, 'ঈমানে সত্তরের বেশি শাখা প্রশাখা আছে। তার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট শাখা হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা আর সর্বনিম্ন শাখা হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা।' (ইবনে মাজাহ)

রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দেখলে সরিয়ে ফেলতে হবে। না হলে নানা রকম দূর্ঘটনা ঘটতে পারে। যেমন কেউ রাস্তায় কলার খোসা ফেলে রাখলে তা আমরা সরিয়ে রাখব। না হলে পথচারী পা পিছলে পড়ে যেতে পারে। তাই কাউকে আমরা কষ্ট দেবো না। আল্লাহ বলেছেন, 'যারা বিশ্বাসী নর-নারীকে বিপদাপন্ন করেছে এবং পরে তওবা করে নাই তাদের জন্য আছে জাহান্নামের শাস্তি, আছে দহনযন্ত্রণা।' (সূরা বুরুজ, আয়াত: ১০)

বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির যুগে সারাবিশ্বে অবাধ তথ্যপ্রবাহ হচ্ছে। যেকোনো খবর মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে যাচ্ছে সারা বিশ্বে। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে ব্যবহার করে গুজব বা বিভিন্ন ভুল তথ্য প্রচার করে মানুষের মান সম্মানকে ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছে যা ইসলামি চিন্তা-চেতনার বিরোধী। কেননা, মহানবি (সা.) বলেছেন, 'তোমরা মুসলমানদেরকে কষ্ট দেবে না, তাদেরকে লজ্জাও দিবে না এবং তাদের গোপন দোষ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হবে না।' (তিরমিযি)

যারা মানুষকে কষ্ট দেয়, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই পার্থিব জীবনে তাদের সাথে মানুষের সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে না। ফলে তাদের দুঃসময়ে কেউ পাশে দাঁড়ায় না। আখিরাতে তারা আমলশূন্য হয়ে আল্লাহর দরবারে হাজির হবে, যদিও তারা এই পৃথিবীতে অনেক ভালো কাজ করে। যেমন হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের উপর জুলুম করে, সে যেন তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয় তার ভাইয়ের পক্ষে তার নিকট হতে পুণ্য কেটে নেয়ার আগেই। কারণ, সেখানে কোনো দিনার বা দিরহাম নেই। তার কাছে যদি পুণ্য না থাকে তাহলে অত্যাচারিত ব্যক্তির পাপ এনে তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে।'
অতএব প্রাত্যহিক জীবনে আমরা মিলেমিশে বসবাস করব। কাউকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকব।

প্রতারণা

প্রতারণা একটি অপরাধ। সমাজের চারিদিকে প্রতারণা ছড়িয়ে পড়েছে। ডিজিটাল ও প্রযুক্তির যুগে প্রতারণার ধরনও পাল্টাচ্ছে। যে রুপেই করা হোক না কেন, প্রতারণা একটি মারাত্মক অপরাধ। এর জন্য যেমন আইনি শাস্তি রয়েছে, তেমনি ধর্মীয় শাস্তি আরও কঠিন ও ভয়াবহ। বর্তমানে একশ্রেণির মানুষ প্রতারণার মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা করছে। আবার কিছু মানুষ সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করে প্রতারণা করছে। স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের নামেও অনেক মানুষ প্রতারণা করছে।
সমাজে কিছু লোক সুযোগ পেলেই প্রতারনার আশ্রয় নেয়। তারা জালিয়াতি ও মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে নানাভাবে প্রতারণা করে মানুষের ক্ষতি সাধন করে। বতর্মানে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে ব্যবহার করেও প্রতারণা করছে একশ্রেণির প্রতারক চক্র। ইসলাম সকল প্রকার প্রতারণাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে মানব জীবনে সততা ও সত্যবাদিতার চর্চা করার গুরুত্বারোপ করে।

কেউ প্রতারণা করলেও আল্লাহ সে সম্পর্কে বেশি অবগত। তাই কারও সাথে কোনোভাবেই প্রতারণা করা যাবে না। আল্লাহ যে সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞাত সে বিষয়ে ঘোষণা দিয়ে বলেছেন –

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ

অর্থ: 'আল্লাহ, নিশ্চয়ই আসমান ও যমিনে কিছুই তাঁর নিকট গোপন থাকে না।'(সূরা আলে-ইমরান, আয়াত: ৫)

এ প্রসঙ্গে হাদিসে এসেছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন –

نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ...عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

অর্থ: 'রাসুল (সা.) প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন।' (মুসলিম)

অন্য এক হাদিসে আছে। রাসুল (সা.) বলেন –

وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ

অর্থ: 'প্রতারণার ঠিকানা জাহান্নাম।' (ইবনু হিব্বান)

রাসুলুল্লাহ (সা.) আরও এক হাদিসে বলেন,

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

অর্থ: 'যে ব্যক্তি প্রতারণা করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।' (মুসলিম)

এ সম্পর্কে হাদিসে এসেছে, ওয়াসিলা ইবনুল আসকা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি: 'যে ব্যক্তি কোনো দোষযুক্ত জিনিস বিক্রি করল, অথচ ক্রেতাকে তা অবগত করল না, সে সর্বদা আল্লাহর ক্ষোভে পতিত থাকবে, অথবা তিনি বলেছেন: ফিরিশতারা অনবরত তার ওপর অভিশাপ দিতে থাকবে।' (ইবনে মাজাহ)

মানবজীবনে সততা বজায় রাখলে তার পুরস্কার অবশ্যই পাওয়া যায়। মহান রাব্বুল আলামিন প্রত্যেক মানুষকে তার সততার পুরস্কার দেবেন। আমরা সর্বপ্রকার প্রতারণ থেকে নিজেকে বিরত রাখব এবং সৎ ও সুন্দরভাবে জীবনযাপন করব।

কাজ: প্রতারণা না করলে কি কি পুরস্কার পাওয়া যায় তার তালিকা তৈরি কর।

অপপ্রচার ও গুজব ছড়ানো

বর্তমান সমাজে অপপ্রচার ও গুজবের ভয়াবহতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে ব্যবহার করে গুজব ছড়ানো হচ্ছে। অপপ্রচার ও গুজবের মাধ্যমে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অস্থিরতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। তথ্য-প্রযুক্তির এই যুগে গুজব ছড়ানোর সবচেয়ে আলোচিত মাধ্যম হলো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে গুজব দ্রুত দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। বাজারে দ্রব্য মূল্যের দাম বৃদ্ধির অস্থিরতা থেকে শুরু করে রাজনৈতিক অস্থিরতার মতো চরম অনাকাঙ্ক্ষিত গুজবও সৃষ্টি করা হচ্ছে।

গুজব রটানো ইসলামের দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট নিষিদ্ধ কাজ। কারণ, কোনো বিষয়ের সঠিক জ্ঞান না থাকলে তা প্রচার করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম । পবিত্র কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ
تُصِيْبُوْا قَوْمًاۢ بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ ○

অর্থ: 'হে মুমিনগণ! যদি কোনো অবিশ্বস্ত লোক তোমাদের নিকট কোনো বার্তা আনয়ন করে, তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে, পাছে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোনো সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত করে বসো এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদেরকে অনুতপ্ত হতে হয়।' (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ০৬)

উপরোক্ত আয়াত থেকে আমরা অনেক কিছুই শিখতে পারি। কোনো বিষয় আমাদের সামনে এলে সাথে সাথে তা প্রচার না করে এ সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে ও বুঝে প্রচার করা ইসলামি দায়িত্ব ও কর্তব্য। সচেতন মানুষের এই দায়িত্বশীলতার দরুণ অন্য মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

কোনো তথ্যের সত্যতা যাচাই না করে প্রচার করার ফলে নিজের ব্যক্তিত্ব ও সম্মান নষ্ট হয়ে যায়। সমাজে সবাই অবিশ্বাস করতে থাকে। হাদিসে এসেছে –

كَفٰى بِالْمَرْءِ اِثْمًا اَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

অর্থ: 'কোনো ব্যক্তির মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, সে কোনো কথা শোনা মাত্রই (যাচাই না করে) বলে বেড়ায়।' (আবু দাউদ)

কাজ: অপপ্রচার ও গুজব ছড়ানোর পরিণতি কী হতে পারে তা জোড়ায় জোড়ায় আলোচনা করো।

খাদ্যে ভেজাল মেশানো

ভেজাল হচ্ছে নৈতিকতা ও মানবতাবিরোধী ঘৃণ্য এক অপরাধের নাম। কোনো সুস্থ মানুষ এ ধরনের অপরাধ করতে পারে না। আমাদের সমাজে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী ও মুনাফালোভী মানুষ রয়েছে যারা অধিক লাভের আশায় খাদ্যে ভেজাল দিয়ে থাকে। শুধু খাদ্যে নয় নানা দ্রব্যে এখন ভেজাল ও অসাধু পন্থা অবলম্বন করা হচ্ছে। খাদ্যে ভেজাল মেশানোর ফলে মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হচ্ছে। খাদ্যে ভেজাল মেশানের ফলে মানুষ মরণব্যাধি ক্যানসারেও আক্রান্ত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। ইসলাম এ সমস্ত কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে হাদিসে এসেছে, হযরত ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন –

مَرَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَعَامٍ وَقَدْ حَسَّنَهُ صَاحِبُهُ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيْهِ فَإِذَا طَعَامٌ
رَدِيْءٌ فَقَالَ بِعْ هٰذَا عَلٰيحِدَةً وَهٰذَا عَلٰى حِدَةٍ. فَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

অর্থ: 'রাসুলুল্লাহ (সা.) একদিন এক স্তূপ খাদ্যসামগ্রীর পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। যার মালিক একে খুব পরিপাটি করে সাজিয়ে রেখেছিল এবং এর প্রশংসা করছিল। তিনি এতে হাত ঢুকিয়ে দিলেন। দেখা গেল যে, এর ভিতরে নিম্নমানের খাদ্যও রয়েছে। তিনি তখন বললেন, এটি পৃথকভাবে বিক্রি করো। কেননা, যে আমাদের সাথে প্রতারণা করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।'(আহমাদ)

কাজ ১: শিক্ষকের নের্তৃত্বে দলগতভাবে সবাই মিলে খাদ্যে ভেজাল মেশানো-সংক্রান্ত ইসলামের নির্দেশনাগুলো ব্যবসায়ীদের অবগতকরণ সংক্রান্ত চর্চা।

কাজ ২: ছোট ছোট কিউ কার্ডের মাধ্যমে ভেজাল মেশানোর নেতিবাচক দিক লিখন ও তা সবাইকে বিতরণ।

অহংকার

অহংকার-এর বাংলা প্রতিশব্দ অহমিকা, বড়াই, গর্ব, দম্ভ, আত্মম্ভরিতা ইত্যাদি। এর আরবি নাম আল-কিবর (اَلْكِبْرُ)-যার অর্থ বড়ত্ব, নিজেকে অন্যের চেয়ে বড় মনে করা। পরিভাষায় অহংকার হলো–অন্য কোনো মানুষ থেকে কোনো দিক থেকে নিজেকে বড়, উত্তম বা উন্নত মনে করা অথবা কাউকে কোনোভাবে নিজের চেয়ে হেয় মনে করা। হাদিসের ভাষায় –

اَلْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ

অর্থ: 'অহংকার হলো সত্যকে দম্ভের সাথে পরিত্যাগ করা এবং মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা।' (মুসলিম)

অহংকারের পরিণতি

মানব চরিত্রের নিন্দনীয় দিক সমূহের মাঝে অহংকার একটি অত্যন্ত জঘন্য দিক। এটি সর্বাধিক নিন্দনীয় স্বভাব। এটি মানব স্বভাবে লুকিয়ে থাকা ছয়টি রিপুর মাঝে একটি। অহংকার একটি নিন্দনীয় মানসিক অনুভূতি। তবে কথা, কাজ ও চাল-চলনের মাধ্যমে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এটি একটি মারাত্মক পাপ এবং এটি কুফরিসহ আরও অনেক পাপের মূল উৎস। বলা হয়, অহংকার হচ্ছে এ জগতের প্রথম পাপ। ইহকাল ও পরকালে অহংকারের অনিষ্ঠতা ভয়াবহ। তাই একে পরিহার করা অত্যাবশ্যক।

অহংকারীকে যেমন আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসেন না তেমনি মানুষও তাকে পছন্দ করে না। আল-কুরআনে মহান আল্লাহ অহংকারীদের অপছন্দ করার কথা বারবার জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন –

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا

অর্থ: 'নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না যারা দাম্ভিক, অহংকারী।' (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৩৬)

অহংকার করে অতীতে বহু জাতি-গোষ্ঠী ধ্বংস হয়ে গেছে। আল-কুরআনে বর্ণিত আদ, সামুদ, ইরাম এবং অন্যান্য অমিত শক্তিধর ও প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী জাতিসমূহের ধ্বংসের অন্যতম কারণ ছিল অহংকার আর সীমালঙ্ঘন। ফিরাউন ও নমরুদও অহংকার আর বাড়াবাড়ি করেই ধ্বংস হয়েছে। অহংকার মানুষের মনুষ্যত্বকে ধ্বংস করে দেয়। অহংকারের কারণেই ইবলিস অভিশপ্ত বিতাড়িত শয়তানে পরিণত হয়েছিল। তাই অহংকার পতনের মূল।

অহংকার আগুন সদৃশ যা মানুষের অন্যান্য সৎ গুণাবলিকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দেয়। মানব চরিত্রে অহংকার প্রবল হলে তখন তার হিতাহিত জ্ঞান হ্রাস পায় এবং তার সুস্থ-স্বাভাবিক বিবেক ও বোধশক্তি লোপ পায়। ফলে সে নিজের চাল-চলন, কথাবার্তা, আচার-আচরণ সব কিছুর উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যা খুশি তা-ই করতে শুরু করে। পরিণতিতে দুনিয়াতে সে পদে পদে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতে থাকে। মানুষ তাকে ঘৃণা করে এবং তার থেকে দূরে চলে যায়।

অহংকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না বরং তাদের জন্য এ জীবনে রয়েছে মর্মন্তুদ ও অপমানজনক শাস্তির ব্যবস্থা। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'হাশরের ময়দানে অহংকারী লোকগুলো পিঁপড়ার মতো করে জড়ো হবে। আপমান তাদের চারদিক হতে ঘিরে ধরবে। তাদেরকে জাহান্নামের এমন একটি স্থানে নিয়ে যাওয়া হবে যার নাম বা'লাস, তার মধ্য থেকে সবচেয়ে উত্তপ্ত অগ্নিশিখা উঠবে এবং তাদেরকে জাহান্নামীদের পূঁজ রক্ত পান করতে দেওয়া হবে, যার নাম তিনাত আল খাবাল।'(তিরমিযি)

হাদিস শরীফে রাসুলুল্লাহ (সা.) আরও বলেন –

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ

অর্থ: 'ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না যার অন্তরে অনু পরিমাণ অহংকার রয়েছে।' (মুসলিম)

অহংকার মানবতার পরিপন্থী কাজ। মানুষের ধন-দৌলত,বিত্ত-বৈভব, সন্তান-সন্তুতি, রূপ-সৌন্দর্য, জ্ঞান-গরিমা, শক্তি-সামর্থ্য-সব কিছুই আল্লাহ তা'আলার দান। তাই অহংকার করার মতো মানুষের নিজের কিছুই নেই। অহংকার একমাত্র মহান আল্লাহর অধিকার। এ জন্য তাঁর এক নাম 'আল মুতাকাব্বির' বা আত্মঅহংকারী। অর্থাৎ মুতাকাব্বির বলা হয় সেই মহান সত্তাকে যাঁর জন্যই কেবল অহংকার, দর্প,গর্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ত্ব সুনির্দিষ্ট।

ইসলাম সব ধরনের অহংকার থেকে দূরে থাকতে নির্দেশ দিয়েছে। মহান আল্লাহ মানুষকে অহংকার পরিহার করে বিনয়ী ও নম্র হওয়ার প্রতি তাগিদ দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'ভূপৃষ্ঠে দম্ভভরে বিচরণ করো না; তুমি তো কখনোই পদভারে ভূপৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনই পর্বতপ্রমাণ হতে পারবে না।' (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত: ৩৭)

আমরা সব ধরনের অহংকার পরিহার করে চলব। বিশেষত অহংকারবশে মানুষকে অবজ্ঞা করব না; উদ্ধতভাবে চলাফেরা করব না; বরং সংযতভাবে চলাফেরা করব এবং সবার সাথে নিচু স্বরে বিনম্র ভাষায় কথা বলব।

কাজ: যেসব আচরণ ও কাজের মাধ্যমে অহংকার প্রকাশ পায়, জোড়ায় কাজের মাধ্যমে তার একটি তালিকা তৈরি করে সেসব আচরণ ও কাজ থেকে মুক্ত থাকতে তোমার প্রতিশ্রুতিমূলক বক্তব্য বন্ধুদের সামনে তুলে ধরো।

হিংসা

হিংসা মানব চরিত্রের এক জঘন্যতম দিক। মানুষে মানুষে কলহের বীজ বপন করে এই হিংসা। প্রকৃতপক্ষে হিংসা অর্থ অন্যের উন্নতি ও কল্যাণ সহ্য করতে না পারা, অন্যের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা ইত্যাদি এটিকে পরশ্রিকাতরতাও বলা হয়। ইসলামি পরিভাষায় অপরের ভালো কিছু দেখে তা ধ্বংস কামনা করা ও নিজে এর অধিকারী হওয়ার বাসনা করা। আরবি ভাষায় হিংসা শব্দটি হাসাদ হিসেবে সর্বাধিক পরিচিত। মহানবি (সা.) বলেছেন, 'তোমরা পরস্পর হিংসা করো না, একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করবে না এবং পরস্পর বিরুদ্ধাচরণ করবে না। বরং সবাই আল্লাহর বান্দা, পরস্পর ভাইভাই হয়ে থাকবে।' (বুখারি ও মুসলিম)

নেতিবাচক প্রভাব: হিংসা একটি মানসিক রোগ। এই রোগ থেকে আরও অনেক রোগের উৎপত্তি হতে পারে। তাই বর্তমানে গবেষকরা শান্তিময় জীবন লাভের জন্য হিংসা-বিদ্বেষ পরিত্যাগের পরামর্শ দেন। আরবিতে একটি প্রবাদ আছে اَلْحَاسِدُ يَحْتَرِقُ بِنَارِالْحَسَدِ অর্থাৎ হিংসুক হিংসার আগুনে জ্বলে। তাই হিংসুকের জীবনে দুর্দশা নেমে আসে। ইসলামের আলোকে চিন্তা করলে হিংসুকের ইমানও প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায়। যেমন মহানবি (সা.) বলেছেন, 'কোনো বান্দার কলবে (হৃদয়ে) ইমান ও হিংসা একসাথে থাকতে পারে না।' (নাসাঈ) সাধারণত আমরা অনেক কষ্ট করে সৎকর্মসমূহ সম্পাদন করি। যদি আমরা মনে হিংসা লালন করি, তাহলে সৎকর্মসমূহ নষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং মহানবি (সা.) আমাদেরকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, 'তোমরা হিংসা থেকে বেঁচে থাকো। কেননা, আগুন যেমন লাকড়ি গ্রাস করে পুড়িয়ে দেয়, হিংসা ও তেমনি মানুষের সৎকর্মসমূহকে গ্রাস করে বা নষ্ট করে দেয় (আবু দাউদ) শুধু তাই নয় হিংসুক ব্যক্তিকে বিশেষ ক্ষমার রাতেও ক্ষমা করা হয় না। যেমন মহানবি (সা.) বলেছেন, শাবান মাসের মধ্যবর্তী রাতে (১৪ শাবান দিবাগত রাতে) বা শবে বরাতে মহান আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন এবং সব বান্দাকে ক্ষমা করেন, শুধু শিরকে লিপ্ত ব্যক্তি এবং ঐ ব্যক্তি যে অন্য(মুসলিম) ভাইয়ের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করে তাকে ছাড়া।' (সিলসিলাতুল আহাদিস সাহিহ)।

হিংসা পরিত্যাগের সুফল: হিংসা পরিত্যাগ করলে জীবনের সমগ্র সুখ ও শান্তি বিরাজমান থাকে। জাতীয় ঐক্য গড়ে ওঠে। দেশ ও জাতি সমৃদ্ধি অর্জন করে। আর একজন মুসলিমের চুড়ান্ত সফলতা হলো, আখিরাতের সফলতা। হিংসা বিদ্বেষ পরিত্যাগের মাধ্যমে একজন মুমিন এই চুড়ান্ত সফলতা অর্জন করতে সমর্থ হয়। প্রিয়নবি (সা.) একদা এক সাহাবিকে জান্নাতি বলে ঘোষণা করেন। তিনি কী আমল করেন এসম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তিনি (জান্নাতি সাহাবি) উত্তরে বলেন, আল্লাহ তা'আলা যাকে কোনো উত্তম বস্তু দান করেছেন, আমি তার প্রতি কখনই হিংসা পোষণ করি না। (ইবনে মাজাহ)

হিংসা পরিত্যাগের উপায়

১. প্রতিদিন মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করা; যেমন আল কুরআনে বর্ণিত হয়েছে

وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

অর্থ: 'আর হিংসুকের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই যখন সে হিংসা করে।' (সূরা আল-ফালাক, আয়াত: ৫)

২. বেশি বেশি সালামের প্রচলন ঘটানো। হাদিসের আলোকে সালামের প্রচলন হলে পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে। হিংসা কমে যাবে।

৩. সম্ভব হলে শরিয়ত সম্মত হাদিয়ার (উপহার) আদান-প্রদান করা। রাসুল (সা.) বলেছে, 'তোমরা পরস্পর হাদিয়া দাও এতে তোমাদের মাঝে ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে।'

ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে হিংসা সম্পূর্ণরূপে হারাম (নিষিদ্ধ)। অতএব, আমরা এই হিংসা থেকে বাঁচার চেষ্টা করব।

ক্রোধ

ক্রোধের শাব্দিক অর্থ রাগ। এটা একটি খুবই শক্তিশালী নেতিবাচক আবেগ। মানুষের আশা ভঙ্গ, নিষ্ফলতা ও ব্যর্থতায় ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হলো ক্রোধ। সাধারণত ঝগড়া, তিরস্কার ও অহংকারের ফলে ক্রোধের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। এই ক্রোধের ফলে জীবনে নেমে আসতে পারে চরম বিপর্যয়।

ক্রোধের অপকারিতা: মানুষের নিন্দনীয় চরিত্রের অন্যতম হলো ক্রোধ। ক্রোধের সময় মানুষের হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়। তাই সে অসংযত হয়ে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটায়। এ কথা সত্য যে রাগ জীবন থেকে কিছু না কিছু কেড়ে নেয়। ক্ষেত্র বিশেষে রাগ প্রদর্শন প্রয়োজন হয়। তবে এর অপব্যবহারে এমনকি এই ক্রোধ আমাদের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ ইমানকেও ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। যেমন- মহানবি (সা.) বলেছেন, 'সিরকা মধুকে যেমন নষ্ট করে, ক্রোধও ইমানকে নষ্ট করে।'(বায়হাকি) একদা এক সাহাবি আমাদের প্রিয় মহানবি (সা.) কে বলেছেন, 'আপনি আমাকে কিছু ভালো কাজের নির্দেশনা দিন। তিনি বললেন, 'তুমি রাগ করো না'। এই ব্যক্তি (সাহাবি) কয়েকবার এই পরামর্শ চাইলেন কিন্তু নবিজি (সা.) প্রতিবারই বলেলেন, রাগ করোনা।' (বুখারি)

ক্রোধ সংবরণের উপকারিতা: মুমিন জীবনের সফলতা হলো আখিরাতে মুক্তির মাধ্যমে অর্জিত হয়। যারা নিজেদের ক্রোধকে সংবরণ করতে পারে তাদের জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়াদা হলো জান্নাত। যেমন- মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা ধাবমান হও স্বীয় প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে এবং সেই জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি, যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল, আল্লাহ সৎকর্ম পরায়ণদের ভালোবাসেন।' (আল ইমরান, আয়াত: ১৩৪)। এছাড়া ক্রোধ সংবরণ করা একটি সাহসিকতাপূর্ণ কাজ। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন–

لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ. اِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِيْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ

অর্থ: 'সে প্রকৃতবীর নয় যে কুস্তিযুদ্ধে খুব লড়তে পারে। বরং সেই প্রকৃত বীর যে ক্রোধের সময় নিজেকে সংযত রাখতে পারে।' (বুখারি ও মুসলিম) এক গবেষণায় দেখা গেছে যারা ক্রোধ লালন করে না তাদের শারীরিক রোগ-ব্যাধি কম হয়।

ক্রোধ দমনের উপায়: পবিত্র হাদিসের আলোকে ক্রোধ দমনের উপায়গুলো নিম্নরূপ –

১. অযু করা। মহানবি (সা.) বলেছেন, 'ক্রোধ শয়তানের পক্ষ থেকে আসে। শয়তান হলো আগুনের তৈরি। আর আগুনকে ঠান্ডা করে পানি। যদি কারও ক্রোধ বা রাগ আসে তার উচিত অযু করে নেওয়া।' (বুখারি)
২. স্থান পরিবর্তন করা। হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, 'যখন তোমাদের কারও রাগ আসে, তখন দাঁড়ানো অবস্থায় থাকলে বসে পড়বে। তাতেও যদি রাগ না কমে, তাহলে সে যেন শুয়ে পড়ে।'
৩. আউজুবিল্লাহ পড়া। মহানবি (সা.) রাগ কমানোর জন্য আউজুবিল্লাহ পড়ার উপদেশ দিতেন, যা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।
৪. চুপ থাকা। মহানবি (সা.) বলেছেন, 'তোমরা শিক্ষা দাও এবং সহজ করো। দ্বীনের বিষয়ে কঠিন করো না। যখন রাগান্বিত হও তখন চুপ থাকো, যখন রাগান্বিত হও চুপ থাকো, যখন রাগান্বিত হও চুপ থাকো।' (মুসনাদ আহমদ)

অতএব আমরা ক্রোধের ভয়াবহতা উপলব্ধি করব। ক্রোধ বর্জন করে সুখে থাকব।

লোভ

মানুষের খারাপ অভ্যাসগুলোর মধ্যে লোভ অন্যতম। লোভ মানুষকে অধঃপতনের দিকে নিয়ে যায়। একজন লোভী মানুষ সকল কিছুতেই লোভ করতে থাকে। সে কোনো কিছুতে তৃপ্ত হয় না। দুনিয়ার যে কোনো জিনিস পায় না কেননা সে আরও পেতে চায়। যার ফলে সে কোনো দিন সুখী হতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ একজন মানুষের যদি একটি জামা থাকে, তাহলে সে আরও একটি জামা পেতে চায়। এভাবে একটি পাবার পরে সে আরও পেতে চায়। একপর্যায়ে সে যখন অনেক জামার মালিক হয়ে যায় সে তখন আরও জামা পেতে চায়। সে কখনো শুকরিয়া আদায় করে না। এভাবে করে একজন মানুষ তার নৈতিকতা হারায়। মানবজীবনে এভাবে প্রতিটি কাজে মানুষ লোভ করতে থাকে। একজন মুমিন বান্দা কখনো লোভী হবে না। আল্লাহ যে নিয়ামত দিয়েছেন তাতে সে শুকরিয়া আদায় করবে। একই সাথে চেষ্টা করে যাবে যাতে ভাগ্যের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারে। এর ফলে নিজের ভাগ্য উন্নয়ন হবে এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন সম্ভব হবে। কেননা, মানব জীবন সংক্ষিপ্ত। মানুষের সংক্ষিপ্ত জীবনে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারলে ইহকাল ও পরকাল উভয়ই কল্যাণ নিশ্চিত হবে।

লোভী ব্যক্তি নিজের অবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে চায় না। তার কাছে যা আছে তাতে সে সুখী হয় না। সে অন্যায়ভাবে আরও পেতে চায়। অতিরিক্ত কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় অবৈধভাবে উপার্জনের দিকে হাত বাড়ায়। লোভ মানুষকে পাপের দিকে নিয়ে যায় আর পাপ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। সম্পদ ও উচ্চভিলাসী জীবন-যাপনের বিষয়ে মানুষকে সতর্ক করে আল-কুরআনে নির্দেশনা এসেছে। কুরআন শরিফের সূরা তাকাসূরে মহান রাব্বুল আলামিন বলেন, 'প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন রাখে, যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও।' (সূরা তাকাসুর, আয়াত: ১-২)

লোভ ও লালসা করাকে ইসলামে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমরা লোভ-লালসা থেকে বেঁচে থাকো, কেননা, এ জিনিসই তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করেছে এবং পরস্পর রক্তপাত ঘটানোর ব্যাপারে উসকিয়ে দিয়েছে। লোভ-লালসার কারণেই তারা হারামকে হালাল সাব্যস্ত করেছে।' (মুসলিম)

কাজ: লোভের নেতিবাচক দিকসমূহ নিয়ে জোড়ায় জোড়ায় কথোপকথন।

এতক্ষণ আমরা বেশ কিছু আখলাকে হামিদাহ এবং আখোলাকে যামিমাহ সম্পর্কে জানলাম। এবার তাহলে আখলাকে হামিদাহ অনুশীলন এবং আখলাকে যামিমাহ থেকে বিরত থাকার পালা। সপ্তম শ্রেণির আর যেটুকু সময় বাকি সেটুকু সময়ে তুমি শ্রেণিকক্ষে সহপাঠী বন্ধুদের সাথে এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে আখলাকে হামিদাহ এর চর্চা করবে। অর্থাৎ ষষ্ঠ এবং সপ্তম শ্রেণি থেকে যে যে আখলাকে হামিদাহ এর বিষয়ে পড়ে ও শিখে এসেছ, সেগুলো এবার বাস্তবে প্রয়োগ করবে। শিক্ষক এ বিষয়ে তোমাকে সঠিক দিকনির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করবেন।